চলো দিল্লী

পঞ্চাঙ্ক নাটক

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র দত্ত

গ্রন্থকারের নিবেদন

নাটকখানি ইংরাজী ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রচিত হয়। সুতরাং নেতাজীর কার্যাবলী সম্বন্ধে সেই সময়ে যতটুকু আলোকপাত হইয়াছিল তাহার বেশী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইতে পায় নাই। মূল ঘটনাগুলি সত্য। টোকিও এবং সোনান্ রেডিও হইতে ইহার অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে। A Rebel Daughter of India এবং লালা উত্তমচাঁদের ডায়েরী হইতেও পরে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

সমসাময়িক চরিত্রাঙ্কনের অনেক বিপদ আছে। তাই চরিত্রগুলিকে যথাসম্ভব typical করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অনেকস্থলে কাল্পনিক নামও দিয়াছি। নেতাজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত চরিত্রবিকাশ করিতে সাহসী হই নাই। ইহার ফলে নাটককে জীবন্ত করিয়া তুলিবার আয়োজন বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। যদি ভরসা না থাকিত যে নেতাজীর অলৌকিক সাধনা ও বাণী স্বীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং সমগ্র নাটকটিকে প্রাণবন্ত করিতে সমর্থ হইবে তবে এই রচনায় প্রবৃত্ত হইতাম না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে নাটকটি অভিনয়ের উপযোগী করিয়া লিখিত হয় নাই। গ্রন্থের কলেবর অত্যধিক স্ফীত হইয়া যাইবে বলিয়া ইহাকে অভিনয়োপযোগী করিয়া লিখি নাই। ইহা শুধু সহৃদয় পাঠকের জন্যই লিখিত হইয়াছে। যদি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য দাবী উত্থাপিত হয় তবে সহজেই ইহাকে অভিনয়ের পদ্ধতিতে ও ছন্দে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া যাইবে। উপন্যাস হইতে অভিনয়োপযোগী নাটকের সৃষ্টি করিতে যতটুকু শ্রম স্বীকার করিতে হয় তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প আয়াসেই ইহা সম্ভব হইবে। ইতি— ১৬ই আশ্বিন ১৩৫৫ সাল।

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র দত্ত

উ প হা র

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী জয়তী রায় চৌধুরীর

করকমলে—

বাঙলার সিংহশিশু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীবীর

সুভাষচন্দ্রের এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

পরম স্নেহে

অ র্পি ত

হইল।

ইতি—

'মহালয়া'
১৬ই আশ্বিন
১৩৫৫

"জ্যোতিষ"

চলো দিল্লী

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কলিকাতা এলগিন রোডে নিজের শোবার ঘরে সুভাষ চন্দ্র ও বিপ্লবীদলের প্রধান সদস্য রণজিত সিং]

সুভাষ — বাড়ীর চারদিকে পুলিশের লোক গিস্ গিস্ করছে। তবু তুমি ওদের নাকের ডগা দিয়ে এমন গট্ গট্ করে চলে এলে কি বলে? ধরা পড়লে সব মাটি হবে যে!

রণজিত—পুলিশের লোক আমায় ধরবে? হা, হা, হা! রুশিয়া ঘুরে এলুম এই যুদ্ধের বাজারে, ওরা জানতেই পারলে না। কি করে এলুম শুনবেন? আপনার দুটি ভাইপো রাস্তায় যাচ্ছিল তাদের ট্যাক্সিতে তুলে নিলুম, বল্লুম, 'সুভাষ বাবুর ভাইপোদের আমার গাড়ীতে পয়সা লাগে না।' ওদের যখন বাড়ী ফিরিয়ে আনলুম তখন দেখি চারটে টিকটিকি বাড়ীর চারপাশে ঘুরছে। মুস্কিল! পকেট থেকে একটা অচল টাকা বার করে বাবুদের পেছনে ছুটলুম, 'বাবু, বাবু, রুপেয়া ঝুটা হায়।' গেটের পাশে যে গোয়েন্দাটা ছিল তাকে ডেকে বল্লুম, "দেখিয়ে তো বাবুসাব,

রূপেয়া বোল্‌তা নেই।" সে দেখে বল্‌লে, 'অচল, চলবে না।' বল্‌লুম, 'গরীব লোক' ট্যাক্সি ভাড়া এমন ঠকলে বাঁচি কি করে?'' সে বল্‌লে 'যাওনা, ঐতো বারান্দায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাকে গিয়ে বল। অচল টাকা তুমি নেবে কেন? বাবান্দায় এসে যাকে পেলুম তাকে বল্‌লুম শিবুকে ডেকে দিতে। তাবপব তো আমার রাজার কাছেই পৌঁছে গেলুম, হা, হা, হা।

সুভাষ — তাই বুল। তা ট্যাক্সি কোথায় বেখে এলে?

বণজিত—বাস্তার ও-পাশে। ভয় নেই নেতাজী, নম্বর ঝুটা।

সুভাষ — সাবাস্ সর্দারজি।

[উভয়ের হাস্য]

রুশিয়াব চিঠি গান্ধীজীর কাছে পৌঁছে দিযেচ?

বণজিত—দিয়েছিলুম, কিন্তু গান্ধীজী রাজী হলেন না।

সুভাষ — কি বল্‌লেন তিনি?

রণজিত—তিনি বললেন, রুশিয়ার সৈন্য হিন্দুস্থান স্বাধীন করতে আসবে না, ও মিছে কথা। আমাদের সাহায্য পেলে রুশিয়া যদি বা ইংরেজকে তাড়াতে পারে, আমরা রুশিয়াকে তাড়াব কি করে।

সুভাষ — রুশিয়াকে জানিয়ে দিয়েচ?

রণজিত—জবাব আমাব মুখেই যাবে। গান্ধীজীব কাছ থেকে সোজা এখানে আসছি।

সুভাষ — তুমি আবার রুশিয়া যাচ্ছ?

রণজিত—হ্যাঁ।

সুভাষ — উত্তম। আমাকেও রুশিয়া যেতে হবে রণজিত সিং।

(পায়চারি করিতে করিতে)

করলেকি মহাত্মাজী? এ-কি করলে তুমি? রুশিয়ার সৈন্য এদেশে আসবে আমাদেরই সহায়তা করতে। তার কি সাহায্য

আমরা নেব, কতটুকু নেব, সে তো আমরাই স্থির করবো, সে তো আমাদেরই হাতে। ঘাড়ে চড়ে বসতে তাকে দেব কেন? ভারতের নেতৃত্ব তেমন বিপর্য্যয়ের প্রতি আজও কি যথেষ্ট সজাগ হয়ে উঠে নি? ভুল করলে, স্বর্ণ সুযোগ হেলায় হারালে গান্ধীজী! পর্য্যুদস্ত, বিপর্যাস্ত ইংরেজ আজ জার্ম্মেনীর প্রবল চাপে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কতদিন থেকে এই স্বর্ণ সুযোগের জন্য ভারত অধীর প্রতীক্ষা করেচে। ইংরেজ একটু সামলে উঠলেই সুযোগটিও হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই তো সময় স্বাধীনতা যুদ্ধের মহাযজ্ঞ উদযাপন করবার। তোমায় আজ পাশে না পাই গান্ধীজী, একাই দাড়াব আমি। যে বিশাল তরু দুই শতাব্দীর জলসিঞ্চনে এই উর্ব্বর মাটির শেষপ্রান্ত অবধি শিকড় চালিয়ে সুদৃঢ় হয়ে ভারতের বুকের উপর চেপে বসেছে, একবার তাকে সবল বাহুতে উপড়ে ফেলতে হবে। সেই নিঃশ্বাসরোধ-কারী বিষবৃক্ষকে একবার সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। একটিবার বুকভরে স্বাধীনতার নিঃশ্বাস লাভ করুক ভারতবাসী। মুক্তির অপূর্ব্ব মহিমায় সেই একটি নিঃশ্বাসই অক্ষয় হবে।—রণজিত সিং।

রণজিত - নেতাজী!

সুভাষ — আমায় যেতেই হবে, আর তো অন্য পথ দেখচি নে! জীবনের চুয়াল্লিশটি বৎসর স্বাধীনতার আবাহন করলুম! আর নয়। দেশ এবার জেগেচে এখন ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যে জন্য দেশবন্ধু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করলেন, আমি পথের ভিখিরি হলুম, তা—সফল হয়েচে। দেশ জেগেচে। আর ভয় নেই। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা পরাজিত হয়েছিলুম দেশ তখনও জাগেনি বলে। এবার দেশ জেগেচে—বাঙলার বিপ্লবী-

দল, যুগান্তর, অনুশীলনদল, পাঞ্জাবের গর্ব্ব বিফল হল দেশ জাগে নি বলে। এবার ইন্ধন প্রস্তুত। বিপ্লবের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিতে হবে, আর দেরি নয়। বৃটেনের বিপর্য্যয়ে আমাদের যে স্বর্ণ সুযোগ সেটা আর হাতছাড়া করা চল্‌বে না।

রণজিত—কিন্তু, নেতাজী, যাবেন কি করে? চারিদিকে সজাগ পাহারা। পুলিশের চোখ এড়িয়ে একপাও যাবার যো নেই। সুভাষচন্দ্রকে যতদিন না জেলে পুরে ফেল্‌তে পারচে ততদিন ওরা এক মুহূর্ত্তও শিথিল হবে না।

সুভাষ — ও ভয়ে পিছিয়ে গেলে চল্‌বে না রণজিত সিং। মারাঠা বীর শিবাজী কি করেছিলেন জানো!

রণজিত—শিবাজীর কথা হিন্দুস্থানের কে না জানে নেতাজী?

সুভাষ — ঔরঙ্গজেব তাকে কারাগারে বন্দী করেছিল একবার।

রণজিত—কিন্তু রাখ্‌তে পারলেন না। হা, হা, হা।

সুভাষ — ঠিক তাই। সম্রাটের সুদৃঢ় কারাগার, সতর্ক প্রহরী সব আয়োজন ই ব্যর্থ হল। কৌশলে তিনি মুক্ত হলেন। ভারত স্বাধীন করবেন এই ছিল তাঁর পণ। সে জন্যই তিনি সফল হলেন।

রণজিত—সন্দেশের ঝুড়ির ভিতর লুকিয়ে চলে এলেন, না নেতাজী? কিন্তু তখন তো আর তার, বেতার হয়নি, হাওয়াগাড়ী, এরোপ্লেনও হয় নি। এখন এই বাজারে ঝুড়ি ছেড়ে যখন বেরুবেন তখন কি করে হবে?

সুভাষ — জানি, জানি, সেদিনের সম্রাট এত শক্তিমান হন নি। জানি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি। কিন্তু বীরকেশরী শিবাজী আজ আমার অন্তরে। যে দীপ্ত শিখা একদিন মারাঠা বীরের বুক থেকে বেরিয়ে কূটচক্রী সম্রাটের লৌহ পিঞ্জরে মুক্তির পথ নির্দ্দেশ সেই অগ্নি আজ আমার বুকে। পথ আমি পাব,

আমায় পথ পেতেই হবে। ভবিষ্যত ভাব্‌বার দিন আজ নয়।
রণজিত সিং !

রণজিত—হুকুম করুন নেতাজী।

সুভাষ — পেশোয়ারে হরবন্‌স্‌কে সঙ্কেত সংবাদ দাও। আজ থেকে সাত দিন পরে দিল্লীর মেলে যে কোন দিন আমি পেশোয়ারে পৌছোব।

রণজিত—আচ্ছা।

সুভাষ — আজ থেকে সপ্তম দিনে রাত ঠিক আটটায় তুমি ট্যাক্সি নিয়ে আস্‌বে। ঝুটা নম্বর তিন চারটে মজুত রেখো, কিছুদূর যেতে হতে পারে। গেটের পাশে আমাকে দেখ্‌তে পেলেই তুমি মোড় থেকে ট্যাক্সি চালিয়ে আস্‌বে, যেন ভাড়ার জন্য আস্‌চ। আমি না ডাক্‌লে থাম্‌বে না, আমি ডাক্‌লে আমাকে তুলে নেবে, সঙ্গে কেউ থাক্‌লে তাকেও নেবে। হয়তো কিছু ঘুরোফিরি করব, কিন্তু এক সময় মহাজাতি সদনে আমি যাবই। আমাকে সেখানে নাবিয়ে দিয়ে তুমি ভাড়া নিয়ে চলে যবে। তারপর রাস্তার মোড় অবধি গিয়ে মহাজাতি সদনের পিছনের রাস্তায় আস্‌বে। সেখানে মহাজাতি সদনের পেছনে আমার অপেক্ষায় থাক্‌বে।

রণজিত— তাই হবে নেতাজী।
কিন্তু মতলবটা এখনও বুঝলুম না। কিছু স্থির করে ফেলেছেন নাকি ?

সুভাষ - কিছুই স্থির করে ফেলিনি সর্দারজী, কিম্বা এতগুলো মাথায় আস্‌চে যে বেছে নিতে পারচি নে। ভাব্‌চি আর ভাব্‌চি। যা হোক্ একটা বেছে নেব, তারপর দুর্গাবলে ঝুলে পড়ব। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব যখন যেমন দেখ্‌তে পাই। তবে এটা

ঠিক, বাড়ীর সবাইকে নিয়ে পুলিশ টানা হ্যাঁচড়া না করে সে বন্দোবস্ত করে যাব। এমন ভাবে যাব যেন হঠাৎ সব পুলিশের চোখের উপর অদৃশ্য হয়ে গেছি। অন্ততঃ শেষ পর্য্যন্ত আমার পাশে পাশে পুলিশের লোক ছাড়া আর কেউ থাকবে না, আত্মীয় স্বজন কেউ ত নয়ই!

রণজিত—বলেন কি ভোজবাজী?

সুভাষ — ও ছাড়া উপায় নেই। এ বাড়ীর একখানি ইঁটও এরা আস্ত রাখবে না যদি বাড়ীর একটি লোককেও এরা সন্দেহ করবার সুযোগ পায়।

রণজিত—তা বটে।

সুভাষ — তোমার বর্দ্ধমানের আড্ডায় খবর দাও। অনেকগুলো ছদ্মবেশ যেন ঠিক করে রাখে। আমি গিয়ে একটা বেছে নেব। জামা জুতোর মাপগুলো যেন ঠিক হয়, ওটা বিশেষ লক্ষ্য রেখো। এখানকার কাজগুলো সারা হলেই তুমি সোজা পেশোয়ারে চলে যাবে। সেখানে হরবন্সের বাড়ীতে আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো।

রণজিত—হায়রে, বাঙালী জাতকে ওরা বলে ভীরু। বাঙালীকে ওরা চেনে না। এই দুঃসাহস শুধু বাঙালার ছেলেই করতে পারে। আমার রাজা! হুকুম ঠিক্ ঠিক্ তামিল করবে বান্দা। জান কবুল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতা পুলিস কমিশনারের দপ্তর। সি, আই, ডি, ইন্‌স্পেক্টরত্রয় হরেন বোস্, শীতল গাঙ্গুলী ও জনার্দ্দন হাজরা।]

হরেন — কি বল্‌লে ? মহাজাতি সদন থেকে সুভাষ বোস্ একদম কর্পূর হয়ে উঠে গেল ? একেবারে নিরুদ্দেশ ?

শীতল — নিরুদ্দেশ ? কোথায় নিরুদ্দেশ হল ? কোন খানে ?

জনার্দ্দন—[মুখ বিকৃত করিয়া] কোথায় নিরুদ্দেশ হল ! তাই যদি জান্‌ব তবে আর ভাবনাটা ছিল কি ?

শীতল — তা নয়, তা নয়, আমি বল্‌চি, কেমন করে নিরুদ্দেশ হল ? এ তো আর, ধরো গে- হুট করে নিরুদ্দেশ হব বল্‌লেই হওয়া যায় না !

জনার্দ্দন—নাও, কেমন করে নিরুদ্দেশ হল তাই এখন বাতলাতে হবে। বলি সেটাই ত সমস্যা হে, নইলে আর সমস্যাটা কি -

শীতল - তা নয়, তা নয়, আমি বলচি, [বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] মাই গড্ ! তা-ই-না-কি !!

হরেন — তুমি বলতে চাও, তোমাদের সবার চোখের উপর, তোমাদের চার জোড়া চোখ মেলে তোমরা চেয়ে দেখলে, সুভাষ বোস্ অন্তর্দ্ধান হল ?

জনার্দ্দন—তা হল।

শীতল — হল ?

হরেন - লাগ ভেল্কী, না যাদুবিদ্যে হে ? বলি মাল একটু বেশী টেনেছিলে নাকি ? এত করে বারণ করলুম পই পই করে বল্‌লুম যে জনার্দ্দন একটু সাম্‌লে চল, সুভাষ বোস্ বড় কঠিন পাত্র। তা কথাটা কানেই তুল্‌লে না। এখন ঠ্যালা সামলাও। সাহেব এখনই এসে পড়বে। কি জবাব দেবে কিছু ঠিক করেছ ?

জনার্দ্দন—ও মাল টাল সব বাজে কথা হরেন দা। তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি বাড়াবাড়ি বেশী কিছু করিনি, কিন্তু চাকরী এবার নির্ঘাত যাবে। অসম্ভব কথা কাকেই বল্‌ব কেই বা বিশ্বাস করবে! ভোজবাজী দেখিয়ে গেল। এখন চোখে সরষে ফুল দেখ্‌চি। ছ'টি মেয়ে পার করতে হবে, দুটো ছেলের পড়ার খরচ। দূর হোক্ গে, খাব কি? ও গলগ্রহগুলো যদি না থাক্‌ত তবে তোর চাকরীতে লাথি মেরে কবে চলে যেতুম। শেয়াল কুকুরের মত ঝড় জলে ভিজে বাইরে পড়ে থাকি, আমার কোন্ বাপের শ্রাদ্ধের দায়ে ও সব করিবে বাপু? এই ভূতের বেগার খেটে খেটে আমার নিজের কোন্ পরমার্থটা লাভ হচ্ছে শুনি?

[পুলিস কমিশনারের প্রবেশ। সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার ও ফাইল হস্তে ষ্টেনোগ্রাফার।]

হরেন, শীতল, জনার্দ্দন গুড্ মর্ণিং স্যর।

কমিশনার—এই যে আপনারা সকলেই এসেচেন। বসুন।

[সকলে বসিলে ষ্টেনোকে লিখিয়া যাইতে ইশারা করিলেন ও ষ্টেনো লিখিতে লাগিল]

৩৮।২নং এলগিন রোড্ এ বোসেদের বাড়ীর উপর নজর রাখবার জন্য ও সুভাষচন্দ্র বোসের উপর বিশেষ নজর রাখবার জন্য আপনাদের চার্জ্জ দেওয়া হয়েছিল। তিন সিফ্‌টে তিনজন করে সাবইন্‌স্পেক্টর আপনাদের সঙ্গে থাক্‌বে সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তাছাড়া সাধারণভাবে পুলিশের সহায়তাও আপনাদের দেওয়া হয়েছিল। আমার ব্যবস্থাগুলো আশাকরি আপনাদের সন্তোষজনকই হয়েছিল?

হরেন, শীতল, জনার্দ্দন—নিশ্চয়ই স্যর্। অবশ্যই স্যর্।

কমিশনার—অন্ততঃ আপনাদের তরফ থেকে এই সম্বন্ধে কোন অভিযোগ

আসে নি।—হ্যাঁ গতকাল সকাল বেলা কে চার্জে ছিলেন ?

হবেন — আমি স্যার্।

কমিশনার—উত্তম।

[ফাইল টানিয়া লইয়া কাগজপত্র কিছুক্ষণ উল্টাইয়া]

আপনার রিপোর্ট দেখলুম। আর কিছু বলবার আছে ?

হবেন — না স্যার্।

কমিশনাব—যে সব তুচ্ছ ঘটনা তখন অবাস্তর বলে মনে হয়েছিল, ভেবে দেখুন এখন তাদের দুটো একটার কোনো মানে হয় কি না।

হবেন — [কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া] না স্যাব। কিছুই তেমন মনে পড়চে না।

কমিশনাব—[ডেপুটিকে] আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করবেন ?

ডেপুটি— না স্যার্।

কমিশনার—[হবেনকে] আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

[যথারীতি অভিবাদন করিয়া হরেনেব প্রস্থান]

তাবপর, বেলা আড়াইটাব সিফ্‌টেব কে চার্জে ছিলেন ?

জনার্দ্দন—[কম্পিত স্বরে] স্যার্ আমি।

কমিশনার—আপনার সিফট রাত্রি ন'টা অবধি ?

জনার্দ্দন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কমিশনার—আপনার সিফটের সুরু থেকে রাত আট্‌টা পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখা যায় নি ?

জনার্দ্দন—আজ্ঞে না।

কমিশনার—নতুন কেউ আসে নি বা নতুন কিছু করা হচ্ছে বলে বোঝা যায় নি।

জনার্দ্দন—আজ্ঞে না, নতুন কেউ আসে নি, নতুন কিছু হচ্ছে বলেও বোঝা যায় নি।

কমিশনার—বোসেদের বাড়ীর সেদিন কে কোথায় গিয়েছিল তার ডায়েরী এই নিন। পড়ে দেখুন এতে কিছু প্রাসঙ্গিক বলে বোধ হয় কি না।

[জনার্দ্দন ডায়েরীটা লইয়া একপাশে সরিয়া গিয়া চোখ বুলাইতে লাগিলেন।]

শীতলবাবু! আপনি রাত্রের সিফ্টের চার্জ্জে ছিলেন?

শীতল—হ্যাঁ হুজুর।

কমিশনার—[রিপোর্ট কিছুক্ষণ উল্টাইয়া] আপনার রিপোর্ট পড়লুম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন সেখানে যান তখন, তার আগে বা পরে, উল্লেখযোগ্য কিছু দেখ্তে পেয়েছিলেন?

শীতল — তা হ্যাঁ হুজুর। সে এক এলাহি ব্যাপার।

কমিশনার—কি, কি?

শীতল — মাঝ রাত্রে হুজুর মেয়েরা কাঁদতে সুরু করলেন। বাড়ীটা কান্নার রবে ফেটে পড়তে লাগ্লো।

কমিশনার—তারপর কি?

শীতল — আজ্ঞে হুজুর, তারপর আর কিছু নয় হুজুর, ঐ কাঁদতে লাগ্লেন।—

কমিশনার—সাট্ আপ্। সে কথা জিজ্ঞেস করিনি। বাক্সপত্র বা মোট ঘাট কিছু নিয়ে কেউ বেরুল? বাড়ীর গাড়ী টাড়ী বেরুল?

শীতল — আজ্ঞে না।

কমিশনার—বাইরে থেকে কেউ এলেন? ঐ যে রিপোর্টে লিখেচেন শরৎ বোস্ এলেন, আর কেউ এলেন?

শীতল — আজ্ঞে না হুজুর।

কমিশনার—শরৎ বাবু কি করলেন?

শীতল — তিনি হুজুর ভিতরে চলে গেলেন।

কমিশনার—একাই এসেছিলেন ?

শীতল — আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

কমিশনার গাড়ীতে আসেন নি ?

শীতল — হ্যাঁ হুজুর।

কমিশনার—তবে ? একাই এসেছিলেন কি রকম ? নিজে ড্রাইভ্ করে তো আসেন নি তিনি !

শীতল — আজ্ঞে না হুজুর, ড্রাইভার ছিল। কিন্তু সর্ব্বক্ষণ ও তার সিটেই ছিল।

কমিশনার—শরৎবাবু কতক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন ?

শীতল - আজ্ঞে, এই মিনিট দশ।

কমিশনার – কিছু করলেন তিনি ?

শীতল — আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

কমিশনার—কি করলেন ?

শীতল — বেরিয়ে এসে আমায় দেখ্‌তে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "সুভাষের কোন খোঁজ পেয়েছেন ?" আমি বললুম, "না মশায়।" তিনি বললেন, "বুঝ্‌তে পারচি না আপনারা তাকে ধরতে পারলেই ভাল হয়, কি না-ধরতে পারলেই ভাল হয়।" তাঁর চোখ ছল ছল করছিল। তিনি চোখ মুছে বললেন, "যেখানে থাকে সে ভাল থাক। কিন্তু কোথায় গেল ? কি করে গেল ? কেনই বা চলে গেল ?"

কমিশনার—আর কিছু ?

শীতল — আজ্ঞে না হুজুর। তখুনি তিনি চলে গেলেন।

কমিশনার—আর কিছু ঘটেছিল ?

শীতল — আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

কমিশনার—কি জল্‌দি বলুন।

শীতল — এই যে বলি হুজুর। বাড়ীর সবাই এসে বার বার খুঁজতে লাগ্‌ল খবর কিছু পাওয়া গেল কিনা, কিছু জানা গেল কিনা, জ্বালাতন, জ্বালাতনের একশেষ করে—

কমিশনার—জ্বালাতনের কথা হচ্ছে না। উল্লেখযোগ্য আর কিছু দেখলেন ?

শীতল — আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখলুম বই কি হুজুর। বাড়ীর সব আলো নিভে গেল তবু কান্না থামে না—

কমিশনার—সাট্ আপ্।

বলি উল্লেখযোগ্য কিছু, অসাধারণ কিছু, অদ্ভুত কিছু, আশ্চর্য্য কিছু হয়েছিল ?

শীতল — [কাতরস্বরে] আজ্ঞে সে সব কিছু নয় হুজুর। ভেল্কী টেল্কী, ভূত টুত, ও সব কখনও হয় ?

কমিশনার—সা-ট্ আ-প্! নিকালো হিঁয়াসে ক্লাউন—

[শীতল সেলাম করিতে করিতে দ্রুত প্রস্থান]

জনারদন বাবু! কিছু পেলেন ?

জনার্দ্দন—আজ্ঞে না, তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কমিশনার—আচ্ছা যাও আটটার সময় কি হল সব বিস্তারিত বলুন।

জনার্দ্দন—রাত আটটার সময় সুভাষ বোস্ বেরিয়ে এলেন। হাঁটতে হাঁটতে গেটের পাশে এলেন।

কমিশনার—কি পরে এলেন ?

জনার্দ্দন— আজ্ঞে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, গায়ে আটপৌরে পশমের চাদর পায়ে সেণ্ডেল।

কমিশনার—হাতে কিছু ছিল ?

জনার্দ্দন— আজ্ঞে না। মনে হল যেন পায়চারি করবার জন্যই বেরুলেন। অসুস্থ বলে চাদরটা গায়ে দিয়েছিলেন।

কমিশনার—মুখের দাড়ি গোঁপ তেমনি ছিল ?

জনার্দ্দন— আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, মুখভরা দাড়িগোঁপ ছিল—কামান নি।

কমিশনার—তারপর ?

জনার্দ্দন— গেটের পাশে আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভালই আছেন ?" আমি বললুম, "আমাদের আর থাকাথাকি মশায়। তিনি বলিলেন, "একটু হাওয়া খেতে বেরুলাম। এই ক'দিনে বিছানায় অরুচি ধরে গেছে। আসুন না, গল্প করে করে যাই।" নানা কথা হতে লাগল, যুদ্ধে কে হারবে, কে জিতবে এই সব। রাস্তায় একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, তিনি ডাকলেন। আমায় বললেন "চলুন না ট্যাক্সিতে একটু ঘুরে আসি।" আমি জিজ্ঞাসা কবলুম, "কোথায় যাবেন ?" তিনি বললেন, "যেখানে খুসী! গঙ্গাব ধাবে। তবে মহাজাতিসদনটা একবার ঘুরে যাব। আমাব মনটা ঐখানেই পড়ে আছে।" আমি বললুম, "একটু অপেক্ষা করবেন কি। আমার একটা কাজ বাকী আছে, সেবে নিয়েই যাচ্ছি।" তিনি বললেন "আচ্ছা।" আমি একটি সব-ইনস্পেক্টরকে ডেকে বললুম, "তোমরা তিনজন অন্য ট্যাক্সি নিয়ে আমাদের পিছু পিছু এস। গেটে দুজন কনেষ্টবল পাহারায় রাখ। কেউ ভিতরে গেলে বাইরে এলে যেন নাম ধাম সব লিখে রাখে।"

কমিশনার কাজটা ঠিক হয়নি। সবাই নাম ধাম দিতে যাবে কেন ?

জনার্দ্দন— আজ্ঞে তখন স্যর কিছু ভেবে উঠতে পারিনি। আর, পুলিশ কোনো প্রশ্ন করলে কেউ জবাব দেবে না এমন স্পর্দ্ধা এদেশের কারো নেই—পুলিশকে এরা চেনে।

কমিশনার থানায় টেলিফোন করেন নি কেন ?

জনার্দ্দন— আজ্ঞে ওটা ভুল হয়ে গেছে। নিজেই সঙ্গে যাচ্ছি, কাজেই অত আর সন্দেহ কিছু করি নি।

কমিশনার—তার পর?

জনার্দ্দন—ট্যাক্সিতে বসেই সুভাষ বাবু মহাজাতি সদনের দিকে যেতে বললেন। যেতে যেতে মহাজাতি সদনের ইতিহাস, উদ্দেশ্য, এইসব বলতে লাগলেন। ট্যাক্সি এসে মহাজাতি সদনে থামল। তিনি নেবে ভাড়া দিয়ে ওটা বিদায় করলেন। ট্যাক্সি চলে গেল। আমাকে বললেন "চলুন একটু ঘুরে দেখি।" আমি রাস্তায় তাকিয়ে দেখলুম সব-ইন্স্পেক্টররা অন্য ট্যাক্সিতে আসছে বললুম, "আপনি এগোন, আমি আসছি।" তিনি হেসে বললেন, "সিগারেট খাওয়া অভ্যেস আছে বুঝি? তা আমার সামনে খেতে সঙ্কোচ করবেন না, খান না দোষ কি?" আমিও সুযোগ পেয়ে বললুম "আপনি অতবড লোক, আপনার সামনে—।" বলতে বলতেই তিনি বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা আমি একটু এগোই, আপনি আসুন, বেশী দেরী করবেন না।" এই বলে তিনি আস্তে আস্তে এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগলেন। আমি একচোক ওঁর দিকে রাখলুম, আর একচোখ রাখলুম রাস্তার দিকে। সব-ইন্স্পেক্টররা কিছুক্ষণেই এসে গেল। তাদের তিনজনকে তিনদিকে নজর রাখবার জন্য পাঠিয়ে দিলুম। ওরা চলে যেতে তাকিয়ে দেখি সুভাষ বোসকে দেখা যাচ্ছে না।

কমিশনার দেখা যাচ্ছে না?

জনার্দ্দন--আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে না! যেখানে ওঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম সেখানে ছুটে গেলুম। তিনি নেই। এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে দেখি কোথাও নেই। ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলুম না। তখন হুইসিল্ বাজালুম সবাই ছুটে এল। এক-জনকে লাল বাজার পাঠিয়ে দিয়ে আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলুম। আধঘণ্টার মধ্যেই সুপার এলেন, কিছুপরেই ডেপুটি

কমিশনারও এলেন। সবাই মিলে আবার দেখলুম, কিন্তু সুভাষ বোসের উদ্দেশ্য আর পাওয়া গেল না।

কমিশনার—হুঁ। মহাজাতি সদন সার্চের রিপোর্ট পেয়েছি। আচ্ছা আনুমানিক কটার সময় বোস অদৃশ্য হলেন?

জনার্দ্দন—আজ্ঞে ঠিক আট্‌টা কুড়ি মিনিটে।

কমিশনার—তারপর সার্চ শেষ করে ডেপুটি কমিশনারের আদেশ মত সুপার ও আপনি এলগিন রোডে চলে এলেন?

জনার্দ্দন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কমিশনার—তখন পৌনে দশটা?

জনার্দ্দন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কমিশনার—সেখানে গিয়ে শুনলেন আটটার পর কেউ আসেনি বা যায়নি?

জনার্দ্দন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কমিশনার—বাড়ীর লোক সব বাড়ীতেই ছিল দেখলেন?

জনার্দ্দন—আজ্ঞে হ্যাঁ। তারা বললেন সুভাষ বাবু সবাইকে বাড়ী থাকতে বলেছিলেন। তিনি নাকি রাত আটটা থেকে এগারটার মধ্যে তাঁর জন্মদিনের উপহার সবাইকে দেবেন বলেছিলেন। সকলে তাই বাড়ীতেই ছিল।

কমিশনার—বাড়ীর চাকররা কেউ কোথাও যায়নি?

জনার্দ্দন—আজ্ঞে না। রাত আটটার পর থেকে বাড়ীসুদ্ধ সবাই বাড়ীতেই ছিল।

কমিশনার—আশ্চর্য্য! আগে বা পরে কোন রকম আয়োজনের কোনো চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। অদ্ভুত এর কার্য্য কলাপ, অদ্ভুত এর ক্ষমতা শুনুন, বোস অদৃশ্য হবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কোনো শব্দ টব্দ শুনতে পেয়েছিলেন? নাঃ, থাক্ ও আর জিজ্ঞেস করে কি হবে!

[একটু পরে] কখন সরেছে জানেন ? যখন আপনি সব-ইনস্পেক্টরদের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আর চেয়ে দেখছিলেন ওরা ঠিক ঠিক মোতায়েন হচ্ছিল কিনা।

জনার্দ্দন— কিন্তু সে তো স্যর আধমিনিটও লাগেনি।

কমিশনার—শপথ করে বলতে পারেন তিন মিনিট লাগেনি ? ও আধ মিনিটই মনে হয়।—যাক্ বোস বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবার সময় কার কার সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা হয় ?

জনার্দ্দন— আজ্ঞে তিনি গত সাতদিন ধরে মৌনী ছিলেন। কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের ঘরে পুরু পর্দ্দা খাটিয়ে সারাদিন সেখানেই কাটিয়ে দিতেন। কাল রাত্রি আটটার পর মৌনভঙ্গ করবেন বলে জানিয়ে ছিলেন।

কমিশনার—হ্যাঁ রিপোর্টে সব দেখলুম তা হলেও তো চাকর কেউ খাবার টাবার নিয়ে আসত, অন্য কাজ টাজ করে দিত ?

জনার্দ্দন—ওঁর পুরানো চাকর শিবু ছুটি নিয়ে বাড়ী গেছে কদিন আগে।

কমিশনার—বাড়ী গেছে ? খবরটা চেক্ করা হয়েছে ?

জনার্দ্দন—আজ্ঞে হ্যাঁ ও ঠিকই বাড়ী গেছে।

কমিশনার—তবে কে কাজ করে দিত ?

জনার্দ্দন—পরদার ভিতরে কারো ঢুকবার অনুমতি ছিল না। খাবার পরদার বাইরে রেখে যাওয়া হত। খাওয়া হলে সুভাষবাবু পাত্রগুলো পরদার বাইরে রেখে দিতেন।

কমিশনার—তবে বোস্ কি করে জানালেন যে কাল রাত্রে সবাইকে তার জন্মদিনের উপহার দেবেন ?

জনার্দ্দন—আজ্ঞে কিছু বলবার থাকলে তিনি তা কাগজে লিখে পরদার বাইরে পিন দিয়ে এঁটে রাখতেন।

কমিশনার—হুঁ। তবে কি করে হল ? আপনার কি মনে হয় ?

জনার্দ্দন—কি বল্‌ব স্যর্‌। আমি একেবারে দিশাহারা হয়ে গেছি। কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল, কি করে কি ঘট্‌ল, কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারচি না।

কমিশনার—হুঁ!—

[কিছুক্ষণ ভাবিয়া] জনার্দ্দন্ হাজরা! আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অন্য প্রমাণ যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ তোমার উপর গুরুতর সন্দেহ অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌চে। জীবিত অথবা মৃত সুভাষবোস্‌কে তুমিই সর্ব্বশেষ দেখেচ। সর্ব্বশেষ তুমিই তার সঙ্গে কিছুক্ষণ একা ছিলে। হয় তুমি তার পলায়নে সহায়তা করেচ, নয় তাকে হত্যা করে তার মৃতদেহ সরিয়েচ। তুমি তদন্তাধীন। তোমাকে আট্‌কে রাখতে আমি বাধ্য হচ্ছি।

[রিভলবার বাহির করিয়া অন্য হাতে বেল টিপিলেন। একটি কনেষ্টবল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।]

ইস্‌কো হাজত মে লে যাও।

কনেষ্টবল—যো হুকুম হুজুর।

জনার্দ্দন—[কনেষ্টবলের টানে যাইতে যাইতে] আরে, কেয়া করতা হায়? আরে,—আমি?—বাঃ, বেশ তো!—আরে!—

কনেষ্টবল—[ষ্টেজের কোনায় পৌঁছিয়া] কেয়া আরে, আরে করতা হ্যায় বাবু? চলো।

[জনার্দ্দনকে লইয়া কনেষ্টবলের প্রস্থান। কমিশনার ষ্টেনোকে লেখা বন্ধ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। খাতাপত্র লইয়া ষ্টেনো প্রস্থান করিল]

কমিশনার—হাওড়া ষ্টেশন, শিয়ালদা ষ্টেশন, দমদম, সব জায়গা থেকেই রিপোর্ট এসেছে। সুভাষ বোস্‌কে কোথাও দেখা যায় নি।

সবগুলো ষ্টেশনেই তার করা হয়েচে, ট্রেন ও ষ্টিমার সার্চ্চ করা হবে সাত দিন। পঁচিশটি স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করেচি ঠিক সেক্রেটারীর নির্দ্দেশ মত। যদি এরোপ্লেনে না গিয়ে থাকে তো এতেই ধরা পরবার কথা। আর নয় তো, কলকাতায় বা আশ পাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে। যদি তাই থাকে, তবে রুটিনমত কাজ করে গেলেই ধরা পড়বে। দমদমে খবর নিয়ে জানলুম যে বৃটিশ এরোপ্লেন ছাড়া বিদেশী কোনো এরোপ্লেন কাল ছাড়েনি। কাজেই মনে হচ্ছে এরোপ্লেনে যায় নি।

[কমিশনারের প্রাইভেট সেক্রেটারীর প্রবেশ]

সেক্রেটারী—মাপ করবেন স্যর। এইমাত্র খবর এসেছে যে কাল শেষরাত্রে ডায়মণ্ড হারবার থেকে একটা জাপানী কার্গো জাহাজ ছেড়েছে।

কমিশনার—সে কি [ডেপুটিকে] আপনার রিপোর্টে তো দেখলুম আপনি মহাজাতি সদন থেকে বেরিয়েই সবগুলো বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন ?

ডেপুটী —তাই করেচি স্যর। কিন্তু ডায়মণ্ড হারবারের কথাটা ভাবতে পারিনি।

সেক্রেটারী—হঠাৎ খেয়াল হল, কোনো জাপানী জাহাজ কাল ছেড়েচে কি না খবর নি। জাপানী কনসালের কাছে খবর নিয়ে ওটা জানতে পারলুম। আমি বলতে, বাধ্য যে জাপানী কনসালের অফিস্ অযথা অনেক করেচে খবরটা দিতে।

কমিশনার—[তৎক্ষণাৎ টেলিফোন হাতে লইয়া] চিফ্ সেক্রেটারী। হ্যালো! গুড্‌মর্ণিং স্যর! ক্যালকাটা পুলিশ কথা বলচি। এইমাত্র খবর পেলুম যে ডায়মণ্ড হারবার থেকে আজ শেষরাত্রে একটা জাপানী জাহাজ কার্গো নিয়ে রওয়ানা হয়েছে। সুভাষ যদি সেই জাহাজে চলে গিয়ে থাকে তবে কি করা উচিত ?

ইয়েস্— ও ইয়েস্ — হ্যাঁ—হুঁ—হুঁ—নো—গুড্ মর্ণিং স্যর।
[টেলিফোন রাখিয়া দিলেন] ওঃ, কি শয়তান।
[কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন স্বগত বলিতে লাগিলেন]
যে জাহাজে জাপানী পতাকা উড়ছে, সে জাহাজ জাপানী এলাকা। সে জাহাজ যতক্ষণ মাঝদরিয়ায় থাকবে ততক্ষণ আমাদের জুরিস্‌ডিক্‌সানের বাইরে। জাপান নিউট্রাল শক্তি, কণ্ট্রাবেণ্ডের অজুহাতে ও আমরা তার জাহাজ খানাতল্লাসী কববার অধিকাবী নই। যদি কোনো বৃটীশ বন্দরে ওটা নোঙর করে তবে লণ্ডন গভর্ণমেণ্ট যদি বা কিছু করতে পারেন, আমরা পারি নে। ড্যাম ইট, যা কিছু করা যায় সবতো একৃস্ট্রাডিসন্ প্রসিডিংস্ করেই করতে হবে। তা রাজনৈতিক অপরাধের জন্য একস্ট্রাডিসন্ প্রসিডিংসের শ্রেফ কোন বিধানই তো আইনে নেই। এখন কি করা যায়? জাপনি যদি স্বেচ্ছায় সুভাষ বোসকে আমাদের হাতে তুলে দেয়, তবেই আমরা তাকে পাব। নইলে ডিপ্লোমেটিক বিভাগের মারফত কাজ চালাতে হবে। চিফ সেক্রেটারী বলছেন যে জাপান স্বেচ্ছায় সুভাষ বোসকে আমাদেব হাতে তুলে দেবে না। জাপানের কূটনীতি নাকি গভীর ঠাঁই। তিনি বললেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী শঙ্করলালের কাছে জাল জাপানী পাশপোর্ট পাওয়া গেছে। সুভাষ বোস সেই ফবওয়ার্ড ব্লকের নেতা। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সুভাস বোসও জাপানেই যাবার আয়োজন করেছে। এখন জাপানের সঙ্গে তার যদি কোন বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েই থাকে তবে আর আমাদের কাজ কি? জাপানই সব ঘাঁটি সামলে নেবে। নাঃ ওসব চেষ্টায় কিছু হবে না। চিফ্ সেক্রেটারী বলেছেন যে ভারত গভর্ণমেণ্ট মারফত লণ্ডনে

কেবল করানো হচ্ছে। ভালই হল, যা করবার ওঁরাই সব করবেন। যোগ্য হাতেই যোগ্য কাজের ভার পড়ল।

ওঃ কি চতুর! দেখতে দেখতে আমাদের হাতের বাইরে চলে গেল!

[সেক্রেটারীর প্রতি] জাপানের পাশপোর্ট যাদের আছে সেইসব ভারতীয়দের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করবার বন্দোবস্ত কর। তাদের বাড়ী সার্চ কর। যাও। আর শরৎ বোসকে আটকাবার সত্বর ব্যবস্থা কর। শীঘ্র যাও।

সেক্রেটারী—ইয়েস স্যর [গমনোদ্যত]

কমিশনার—আর হ্যাঁ, সেন্সর সিপ্ অফিস থেকে রিপোর্ট এসেছে?

সেক্রেটারী—আজ্ঞে হ্যাঁ সুভাস বোস ও বোসেদের বাড়ীর সব চিঠিপত্র ও টেলিফোনই যুদ্ধের সুরু থেকে সেন্সর করা হচ্ছে। তাতে উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া যায়নি।

কমিশনার—হুঁ! এলগিন রোডের বাড়ীতে আগের মতই কড়া নজর চলবে। জেরা চালাতে থাক। আর শরৎ বোস যতদিন না গ্রেপ্তার হচ্ছে ততদিন ওর বাড়ীতেও নজর রাখবে। যাও।

সেক্রেটারী—ইয়েস্ স্যর [প্রস্থান]

ডেপুটী—কি সেয়ানা লোক! একটু চিহ্ন পর্য্যন্ত রেখে যায়নি! এই লোকগুলো যদি ডাকাতি করতে সুরু করে তবে আমাদের আহার নিদ্রা ঘুচে যাবে।

কমিশনার—লোকটার অসাধারণ ক্ষমতা যদি বাঁচে তবে পৃথিবীতে এমন কিছু দেখাবে যা'র দিকে চেয়ে লোকের চোখ ঝল্‌সে যাবে। ত্রিশ বছর এই কাজে চুল পাকিয়েছি, আঁটঘাট সব সব মোটামোট আয়ত্ত ও হয়েছে, কিন্তু আমাকেই যদি ওর

কাজটা করতে হত তবে এমন নিখুঁত ভাবে এটা করে উঠতে পারতুম না।

ডেপুটী—আচ্ছা পাব্লিক কি বলচে?

কমিশনার—অধিকাংশেরই এই ধারণা যে বোস সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয় পাহাড়ে চলে গেছে।

ডেপুটী—হিমালয় পাহাড়ে, সাধনার জন্য?

কমিশনার- হ্যাঁ

ডেপুটী --তিনি কি ইয়োগী ছিলেন?

কমিশনার—নইলে আমাদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন কি করে? [ম্লানহাস্য]

কিন্তু কানাঘুসো চলছে শোনা যায় যে আমরাই তাকে ভুলিয়ে নিয়ে কোনো অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে রেখেছি। মন্দ উদ্দেশ্যেই নিশ্চয়। নইলে পুলিশের লোক এই সামান্য ব্যাপারটার কিনারা করতে পারলে না, ওটা নিতান্তই বিশ্বাসের অযোগ্য, এই তাদের

চ্যাম নিজের দেশের এমন লোকটাকে এরা চেনে না।

[সহসা] এবার খুব জিতে গেলে বোস! কিন্তু আশা করি শীঘ্র আর একবার তোমার মুখোমুখি হবার সুযোগ পাব। তখন ও রকম রড়ের কিস্তিতে মাত করে দিতে পারবে সে আশা করো না। আর, যদি আশে পাশেই কোথাও থাকো তবে আমার হাতে তোমার নিস্তার নেই। তোমার মহাজাতি সদনই আমার প্রধান অস্ত্র। ঘুরে ফিরে এই মহাজাতিসদনে তুমি একবার আসবেই। ঐটে তোমার মনের আসল কেন্দ্র। সেজন্য আমি নিজেই এই মহাজাতি সদনের ভার নিলুম।

তৃতীয় দৃশ্য

[পেশোয়ার। হরবন্‌সের বহির্বাটী। জিয়াউদ্দিন বেশধারী সুভাষচন্দ্র গোঁপদাড়ী মুসলমানী কেতায় ছাঁটা ও মেহেদী মাখা। সুরমা টানা চোখ। পরনে আঁট পায়জামা, শেরওয়ানী ও ফেজ।]

সুভাষ — দেখি চিনতে পারে কিনা।

[হরবন্‌সের প্রবেশ]

হরবন্‌স্—আদাবরস্। বসুন, বসুন। তারপর কি চাই বলুন ত?

সুভাষ — এই যে হরবন্‌স্ বাবু! একটু জিবিয়ে নি মশাই। ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে গেলুম। কি চাই বল্‌ব বইকি। নিশ্চয় বল্‌ব বল্‌বার জন্যই ত আসা। ততক্ষণ এককাপ্ চা ফরমাস করুন দেখি। যা রেশনের দিনকাল পড়েচে আর সোয়াস্তি নেই মশায়। চা জোটে তো চিনি জোটে না, যত পাঁচ মিশালী চা। আমি আবার যা তা চা খেতে পারি নে। খাঁটি অরেঞ্জ পিকো নেই? তা নেই থাক ব্রুকবণ্ড হলেই চল্‌বে। হ্যাঁ অমনি দুটো পকৌড়ীর কথাও বলে দিন তো। নোন্‌তা মুখ না করলে আমার আবার চা খেয়ে জুত হয় না।

হরবন্‌স্—[স্বগত] আরে লোকটা যে জমিয়ে বস্‌ল দেখচি? আজ থেকে যে কোনদিন দিল্লী মেলে নেতাজীর আসবার কথা। একটু পরেই ষ্টেশনে যেতে হবে। আর আপদটা কি না ঠিক এই সময়েই এসে জুটল!

সুভাষ — [জের টানিয়া] তা, দেখুন, দুটো পকৌড়ী বলছি বলে দুটোই ভাববেন না যেন। আর দেখছেন তো চেহারা? দুতিন রকম হলেই ভাল হয়। জানেন তো—

হরবনস্—আপনার দরকারটা তো কিছু বললেন না। আর, মাপ করবেন আপনার পরিচয়টা তো—

সুভাষ — হচ্ছে, হচ্ছে, পরিচয় পাবেন বই কি। সবই হবে। একটু জিরিয়ে নি, যা হয়রান হওয়া গেছে।

হরবনস্—দেখুন আমি একটু ব্যস্ত আছি। আপনি না হয় ভাল করে জিরিয়ে নিয়ে অন্য সময় আসুন না? তখন কথাবার্ত্তা হবে?

সুভাষ—সেটা কি একটা কথা হল মশাই? দিল্লীর মেল এসে গেছে। আমার কি মরবার ফুরসুত আছে? আধ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট করতে হবে। অন্য সময়!—

অন্য সময় পাচ্ছি কোথায় যে আবার আসব?

হরবনস্—দিল্লী মেল এসে গেছে? বলেন কি? ওরা যে বল্‌লে আজ তিন ঘণ্টা লেট্?

সুভাষ — হতে পারত, কিন্তু হয় নি। ওরা আন্দাজে বলে মশাই। আজকাল সব মিলিটারী মরজী কিনা! দেরাদুনে সেদিন "বল" নাচের জন্য চার ঘণ্টা গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখলে।

হরবনস্—[স্বগত] কি করি, কি করি, মেল্ এসে গেছে। নেতাজী হয় তো এখনি এসে পড়বেন।

[উত্তেজিত ভাবে ও অনুরূপ কণ্ঠে]

এই বেয়ারা, বেয়ারা, বেয়ারা—

সুভাষ — তা বেশ, বেশ, আপনিও ওই সঙ্গে এক কাপ্ চা খেয়ে নিন্ না চাঙ্গা হবেন। এক কাপ চা বল্‌চি বলে আমার জন্য এক কাপই বলবেন না যেন।

[বেয়ারার প্রবেশ]

হরবনস—[অস্থির ভাবে] চা, চা, জল্‌দি চা না, আচ্ছা আমিই যাচ্ছি যা।

[বেয়ারার প্রস্থান ও হরবন্‌সের অন্দর বাটীতে গমনোদ্যোগ]

সুভাষ উহুঁ উটি চলবে না। চোখের আড়ালে যাওয়া চলবে না।

হরবন্‌স—তার মানে ?

সুভাষ — মানে যা বলছি, ঠিক তাই। যা করবার আমার চোখের সামনে করতে হবে।

হরবন্‌স—কি গাঁজাখোরের মত কথা বলছেন মশাই ?

সুভাষ — গাঁজাখোরই হই আর যাই হই। ভারত রক্ষা আইনটা তো আর গাঁজাখুরী নয়। ওসব মতলব ছাড়ুন।

হরবন্‌স—কে, কে মশাই আপনি ? মতলবটা কি দেখলেন শুনি ?

সুভাষ — মতলব তো আর চোখে দেখা যায় না, হেঁ হেঁ—ওটা আন্দাজ করে নিতে হয়। [দাড়িতে হাত বুলাইয়া] বিসমল্লা।

হরবন্‌স—[রাগে কণ্ঠস্বর আটকাইয়া যাইতে লাগিল] আন্দা—আন্দাজ বেরিয়ে যাও, এখখুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।—

সুভাষ — তার অত তাড়াতাড়ি কি ? আপনাকে আর আপনার বাঙালী দোস্তটীকে নিয়েই একেবারে বেরুব। আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য বাইরে সব প্রস্তুত আছে।

হরবন্‌স—বাঙালী দোস্ত মানে ? এখানে বাঙালী ফাঙালী দোস্ত কেউ নেই।

সুভাষ — কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে দেখলুম মশাই। ধুতি পাঞ্জাবী পরা দিব্যি নধর পুষ্ট এক বাঙালী বাবু এই খানিক আগে আপনার বাড়ী ঢুকল !

হরবন্‌স—তোমার গুষ্টির পিণ্ডী দেখেছ, তোমার—

সুভাষ — কেয়া ?—

হরবন্‌স—হায়, হায়, কি হবে—

সুভাষ — কলকাতার সুভাষ বোস ফেরারী হয়েছে জানেন ?—উঁহু

পালাবার চেষ্টা করবেন না। বাড়ীর চারিদিকে সজাগ পাহারা রয়েছে, সজাগ পাহারা!—বিসমল্লা?

হরবন্স—[হঠাৎ গুপ্তস্থান হইতে রিভলবার বাহির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে] নেতাজী, নেতাজী, পুলিশ আত্মরক্ষা করুন।·· [রিভলভার সুভাষের মুখের কাছে ধরিয়া] তবে রে টিকটিকি? এবার তোমার জাহান্নমের পাহারা ঘুচিয়ে দিচ্ছি।

সুভাষ — করো কি, করো কি হরবন্স! আমায় চিনতে পারলে না?

হরবন্স—[চমকিয়া] কে?

সুভাষ—[হাসিয়া] কেমন জব্দ?

হরবন্স—[উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন] আপনি? নেতাজী?

[পাগলের মত অট্টহাস্য]

সুভাষ — [হাসিতে হাসিতে] চুপ, চুপ ভিতরে চলো।

হরবন্স—বাপ্ রে! আমার পীলে শুদ্ধ চমকে দিয়েছিলেন যে নেতাজী! এতও আপনার আসে? কোথাকার কি, আর আমার কিনা সারা দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে আসছিল? ওঃ কি ভেকই না পালটেছেন? কার সাধ্য সুভাষ বোস বলে সন্দেহ করে? বাজিয়ে দেখছিলেন বুঝি? পরখ করছিলেন যে আমরা মুখেই নেতাজীর জন্য প্রাণ দেই কিনা? হা, হা, হা, হা, আসুন আসুন সব তৈরী আছে। পকৌড়ী নেই বটে তবে হতে কতক্ষণ?

হা, হা, হা।

চতুর্থ দৃশ্য

পেশোয়ার।

[হরবনসের অন্দর বাটীতে গুপ্ত কক্ষ। সুভাষচন্দ্র, হরবনস্ ও ফরওয়ার্ড ব্লকের কয়েকজন বিপ্লবী কর্ম্মী]

হরবনস্—না জীয়াউদ্দীন সাহেবকে কেউ সন্দেহ করে নি, শিউশরণ খবর দিয়েচে। এবার নিশ্চিন্ত হোন।—তারপর ? রণজিত আপনাকে মহাজাতি সদনে নামিয়ে দিয়ে ঘুরে মহাজাতি সদনের পেছন দিকে এসে আপনার অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। তারপর কি হল ?

সুভাষ — আমার তখন একমাত্র ভাবনা জনার্দ্দন হাজরার চোখে কি করে ধুলো দিই। জান তো মহাজাতি সদনের ডিজাইনটা আমিই দিয়েছিলুম ? তাতে মাটির নীচে সেল্‌টারের ব্যবস্থা ছিল। সেটাই কাজে লেগে গেল। আমি নেবেই সেল্‌টারের মুখ খুঁজে নিলুম, তারপর এদিক্ ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। জনার্দ্দন হাজরা যখন তার লোকগুলোকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল তখন আমি একবার ইচ্ছে করেই মাটিতে বসে পড়লুম। সে তখন এত নিবিষ্ট হয়ে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে ওটা লক্ষ্যই করলে না। আমি তখনই আর দাঁড়ালুম না। বসে বসেই সেল্‌টারের মুখে চলে এলুম। তারপর সেল্‌টারে ঢুকে পড়েই বাক্সটা তুলে নিয়ে অন্যমুখ দিয়ে দে ছুট্ একেবারে রণজিতের ট্যাক্সিতে।

[সকলের হাস্য]

ভগতরাম—বাক্সটা আগেই সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বুঝি ?

সুভাষ — হ্যাঁ সাতদিন আগে।

[সকলে আবার হাসিয়া উঠিলেন]

সর্দ্দারজীর ট্যাক্সি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। পৈতৃক প্রাণটার সবটুকু নিয়ে কি করে কখন যে বর্দ্ধমানে এসে গেলুম জানি নে। সর্দ্দারজীর আড্ডায় গিয়ে বেশভূষা ও চেহারাটা বদ্‌লে জীয়াউদ্দিন সেজে গেলুম। চশমাটা পকেটে ফেললুম। আড্ডা থেকে একটা ভাল সিডান গাড়ী বেছে নিয়ে তাতে চেপে তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে এসে দেখি পাঞ্জাব মেল্ তখনও আসে নি। ব্যস্ সেই সিডান গাড়ীতেই আবার যাত্রা সুরু হল। দৌড়, দৌড়, অনেকটা পথ এসে হঠাৎ দেখলুম একটা ষ্টেশনে সিগ্‌নেল ডাউন হচ্ছে। অম্নি সর্দ্দারজীকে দিল্লীর টিকিট কিনতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একটা খালি সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠে পড়লুম। তারপর দরজা জানালা ভালকরে ভিতর থেকে এঁটে দিয়ে সটান শুয়ে পড়লুম। এই কন্‌কনে শীত! আকণ্ঠ গরম জামাতেও কুলোচ্ছিল না। তবু ঘুম এসে গেল। হঠাৎ একটা সোরগোল শুনে জেগে উঠ্‌লুম। দরজার শার্সীটা খুলে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি টিকটিকি লেগেচে। আমি খাস উর্দ্দুতে জিজ্ঞেস করলুম, "কি হয়েচে? ওটা কোন ষ্টেশন?" ওরা বললে, "পাটনা, বার্থ খালি আছে!" আমি বললুম "হ্যাঁ।" তখন একজন ঢুকতে চাইলে। আমি দরজার ক্যাচ্ খুলে দিলুম। লোকটা চারদিকে দেখলে, উপর নীচ দেখলে, বাথ্‌রুম ও দেখলে। তারপর নেমে যেতে যেতে বললে, "দেখি অন্য কামরা পাই কি না।" ওরা চলে গেলে আমি একচোট হেসে নিলুম।

বলবন্ত —বলেন কি? বর্দ্ধমান থেকে পেশোয়ার এই জীয়াউদ্দীন সেজে চলে এলেন? ওটা দুঃসাহস করেছিলেন নেতাজী। যদি কোথাও কিছু ভুলচুক হয়ে যেত?

সুভাষ — তবে এতখানি প্রসাধন সত্ত্বেও জিয়াউদ্দীন নই বলে কেউ

সন্দেহ করে বস্‌ত, এই বল্‌চ তো ? কিন্তু আমিই কি হাতদুটো বাড়িয়ে দিয়ে ততক্ষণ সাধাসাধি কবতুম যে হাতকড়াটা আল-গোছে লাগিয়ে দাও বাপু ?

হরবন্‌স্‌—ওস্তাদজীকে তো চিনলে না বলবন্ত ! যখন যেমন তখন তেমন ঐ ঝোলাতে কত ঘেল্‌ই যে লুকানো আছে ! সাগবেদি কববাব এমন সুপাত্র আর পাবে না বলবন্ত, আমি কত দেখে দেখে চুল প্যাকালুম।

ইন্দেব —পাটনার'পর আর টিকৃটিকি লাগে নি ?

সুভায — হ্যাঁ, পর পব সব ষ্টেশনেই ওবা সার্চ্চ করেচে কিন্তু আমাকে আব জ্বালাতন করে নি। ষ্টেশনে গাড়ী থামলেই আমি খববেব কাগজটা মুখের সামনে মেলে ধরতুম। আমাব কামবাটা প্রায় খালিই ছিল। একবার শুধু একটি শিখ ভদ্রলোক উঠেছিল তার সঙ্গে উর্দ্দুতেই কথা হল। সে কথায় কথায় অমাব পবিচয় জান্‌তে চাইলে। বললুম, "আমি জিয়াউদ্দীন, লক্ষ্ণৌ থাকি, জীবন বীমার কাজ করি, সেই কাজে রাওলপিণ্ডী যাচ্ছি।" ঘণ্টা দশ পরে সে একটা ষ্টেশনে নেবে গেল। আমি বেশ লক্ষ্য করলুম আমার কথাবার্ত্তায়, চালচলনে তাব মনে এতটুকু সন্দেহ হয় নি। তখন খুব ভবসা হল যে ছদ্মবেশটা আব ধরা পড়বে না। দিল্লী পৌঁছে গেলুম শেষরাত্রে। সবার পিছু পিছু বেরিয়ে এলুম। তাবপর অন্য গেট্‌ দিয়ে ঢুকে পেশোয়ারের টিকিট করলুম। লক্ষ্য করে দেখলুম যে ওদের নজর শুধু গাড়ীতে যারা যারা রয়েচে তাদেরই উপর। দিল্লী থেকে যারা গাড়ীতে উঠ্‌ল তাদের ওরা একটু সন্দেহ করচে না। তখন মুখ উঁচিয়ে বসেই রইলাম।

হরবন্‌স্‌—বলিহারি নেতাজী। এইবার সব বুঝতে পারছি। সোজা

পেশোয়ারের টিকিট নেননি পাছে কেউ সন্দেহ করে। তাই দিল্লীর টিকিট নিলেন। সব জায়গা থেকেই লোক হামেশা দিল্লী যাচ্ছে। ও নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। আবার দিল্লী থেকে পেশোয়ারে হামেশাই লোক যাচ্ছে, হঠাৎ চোখে পড়বার মত ওটাও কিছু নয়। ওস্তাদিটা দেখ জগতরাম। আর, পারতো এমন খানদান রপ্ত করে নেবার আর্জিটা হুজুরে মঞ্জুর করিয়ে ফেল। হা, হা, হা, বলিহারি আমাদের রাজা বলিহারি নেতাজী!

সুভাষ— শুনলে? হবরন্সের কথা তোমরা শুনলে? একটা খুনোখুনী হল না, একটা লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটল না, একটা ওয়াট্‌সনকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখলুম না, ছুট করে এরোপ্লেনের ল্যাজ ধরে আকাশেও উঠে পড়লুম না, নিদেন পক্ষে একটা হাতাহাতিও হল না, দিব্যি আরাম করে ট্রেনে চড়ে পালিয়ে এলুম কিনা তাই বেচারা ভারী মনঃক্ষুণ্ণ হয়েচে! দেখোনা, কেমন খুঁটে খুঁটে ছোটখাট কথাগুলো বার করছে আর তাই নিয়ে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করচে। ভাবখানা এই যেন আমার পক্ষে ঐ গুলোই মস্ত বাহাদুরীর কাজ হয়েচে।—না হে না, একটা বড় রকমের কাজই করে ফেলেচি, তা হিংসে কর আর নাই কর।

[সকলের উচ্চ হাস্য]

[শিউশরণের প্রবেশ। শিউশরণ ফরওয়ার্ড ব্লকের গুপ্ত কর্ম্মী, পুলিশে কাজ করে]

শিউশরণ— এ যে গুলজার!

সুভাষ — ঐরে! এতক্ষণে প্রধান হিংসুটে এলেন। আর্য্যাবর্ত্তের একপ্রান্তে ডুব মেরে অন্যপ্রান্তে ভেসে উঠলুম, একটু দম নেব না?

শিউশরণ—এদিকে প্রভুরাও যে ডবল দম দেবার আয়োজন করচে। একেবারে দমদম পৌঁছে দেবে। বিলেত থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কৈফিয়ত তলব হচ্ছে। বাইরে যাবার ঘাঁটিগুলো আগলে রাখবার এমন ব্যবস্থা হয়েছে যে মক্ষিকাও অনুবীক্ষণের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

সুভাষ — জাল ফেলেচে শিউশরণ, ইংরেজ তার সূক্ষ্ম জাল ছড়িয়েচে। কিন্তু এখনও ছেঁকে তুলেনি, ভয় নেই।—
এবার নেতাজীর অগ্নি পরীক্ষা হবে। ইংরেজের বিশাল দংষ্ট্রা দেখে মূর্চ্ছিত হবার পাত্র সে নয়। নির্ঝঞ্ঝাটে বৃটিশ বাঘের কবল থেকে মুক্তি সে দুরাশা সে কখনও করে নি।—
শিউশরণ!

শিউশরণ—নেতাজী।

সুভাষ — সর্দারজী বলেছিল, "সন্দেশের ঝুড়ি থেকে যখন বেরোবেন তখন কি করে কি হবে!" যে সংবাদ এনেছ তাতে বুঝতে পারছি ঝুড়ি থেকে সদরে পা দেওয়া আপাততঃ চলবে না। জাল পাশপোর্ট নিয়ে সদর রাস্তা দিয়ে আরাম করে কাবুলে যাওয়া এবার আর কপালে নেই। অন্য উপায় খুঁজে নিতে হবে। হরবন্স্! ম্যাপটা আনো। আজ শেষরাত্রেই বেরিয়ে পড়ব।

হরবন্স্—না, না, নেতাজী।

শিউশরণ—একটু অপেক্ষা করুন নেতাজী, রণজিত সিং কাল আসচে, এইটুকু সময় অপেক্ষা করুন। সে এলে সকলে মিলে যা হয় একটা স্থির করব নেতাজী।

সুভাষ — তা হয় না শিউশরণ। জাল ফেলেচে যখন সঠিক জেনেচি, তখন এ ও জানি জাল গুটোবার আর দেরি নেই। বিশেষ

বিলেত থেকে প্রভুরা যখন বেদম তাড়া লাগিয়েছে। রণজিতকে বলো সদর রাস্তায় ডাকা হয়ে যেন কাবুলে চলে যায়। সেইখানেই আমার সঙ্গে দেখা হবে। ওর আসল পাশপোর্ট আছে, ওর কোনো ভয় নেই।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কাবুল। শিখ ড্রাইভারদের বাসস্থান। রণজিত সিং ও ভগতরাম।]

রণজিত—এই ক'ঘণ্টার তর সইল না ?

ভগতরাম—নেতাজী কিছুতেই মানলেন না।

রণজিত—আর তোমরা কি করলে? নেতাজীকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে তোমাদের এতটুকু দ্বিধা এল না? তোমাদের সর্ব্বদেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল বুঝি?—তোমরা পায়ে ধরে পড়ে রইলে না কেন? আমি এসে যা করবার করতুম?

ভগতরাম—কিছুই হত না সর্দ্দারজী। তুমি এসেও কিছুই করতে পারতে না। নেতাজীকে নিরস্ত করবার জন্য আমরা প্রাণপণ করেছি। কিন্তু কার সাধ্য তার আদেশ লঙ্ঘন করে? তিনি বললেন, "তোমরা যদি হুকুম না মানো তবে আজ থেকে নেতাজী বলে আর ডেকো না। সৈনিকের কর্ত্তব্য সেনাপতির আদেশ পালন করা। যারা সৈনিক নও তাদের বলচি তারা সবে যাও। এখন তাদের নিয়ে কালক্ষেপ করবার আমার অবকাশ নেই।"

রণজিত—হ্যাঁ মরদ বটে!—

কার এমন বুকের পাটা যে আফ্রিদি মহাসন্দের মুল্লুকে একলা প্রবেশ করতে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না? যে মুল্লুকে অপরিচিত মানুষ মাত্রই দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য দস্যুর ন্যায্য শিকার, আগে বধ করে

পরে যারা কয়, তাদের দেশে যে একলা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সে আসল সের। সারা দুনিয়া তাকে মানবে। আলবৎ মানবে। আমি ভুল বুঝেছিলুম ভগতরাম। তোমরা ঠিকই করেচ।

ভগতরাম—নেতাজী বললেন, "আফ্রিদি মহাসন্দ্‌কে আমার ভয় নেই। তারা স্বাধীন, তারা স্বাধীনতা প্রিয়। স্বাধীনতাকামীর মর্ম্মবাণী তারা বুঝ্‌বে। আর যদি মৃত্যু হয় তবে স্বাধীন দেশেই মরব, আমার এতটুকু খেদ নেই।"

রণজিত—আমার রাজা!

ভগতরাম—আমরা সবাই সঙ্গে যেতে চাইলুম। কিন্তু নেতাজী কাউকে সঙ্গে নিতে রাজী হলেন না। বললেন, "ও পথে একলাই যেতে হয়।" আমরা একবাক্যে বললুম, "এত নির্ম্মম হবেন না নেতাজী। ওপথে পায়ে পায়ে জীবনের আশঙ্কা আছে। সারা পথ আমরা বুক দিয়ে ঘিরে রক্ষা করব এতটুকু ভিক্ষা চাই। এইটুকু যদি না করতে পাই তবে ধিক্‌ আমাদের জীবনে। তার চেয়ে আমাদের মেরে ফেলুন।" তিনি মৃদু হেসে বললেন, "লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার এর চেয়ে ভালপন্থা আর কি হতে পারে বল তো?" তারপর তার কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে উঠ্‌ল। তিনি বললেন, "তোমরা অবোধের মত কথা বলচ কেন? কোটি কোটি নর নারীর কত শতাব্দীর অশ্রুজল প্লাবনের মত ভারত মাতার বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে, শুন্‌চনা তার আর্ত্তনাদ? মর্ম্মে কি পৌছোয় নি সে হাহাকার? আজ কি আমাকে আগ্‌লে রাখবার দিন? পথ ছাড়ো।"

রণজিত—ধন্য বীর প্রসবিণী মাতা। এমন কোলে করেচ তোমার আর দুঃখ কি মা? আটত্রিশ কোটি নর নারীর স্বাধীনতার যজ্ঞে

পূর্ণ সমিধ যে আহবণ করবে এই তো সেই দুর্গমের মহাযাত্রী। হিংস্র শ্বাপদ, সরীসৃপ সঙ্কুল দুরূহ পথে পায়ে পায়ে জীবনের আশঙ্কা নিয়েই এই তো সে বেবিয়ে পড়ল একা। আত্মীয় পবিজন স্নেহের বাঁধনে পারে নি বেঁধে বাখতে, সম্পদে বিপদে নিত্য সহচর নতশিরে দাঁড়াল পথ ছেড়ে। নবঘাতী দস্যুব তীক্ষ্ণ অস্ত্র বক্তপানে পবাঙ্মুখ হল। দেখচ না ভগতবাম, বিধাতাব অপূর্ব্ব সৃষ্টি? বিংশতিবর্ষ অবিবাম অত্যাচাবে, উৎপীডনে আজও যাকে কেউ পঙ্গু কবে ফেলতে পাবে নি, তাব গতি রোধ কববে কে?

[অমব নাথেব প্রবেশ]

অমব — নমস্তে সর্দ্দারজী।

বণজিত—এই যে অমব নাথ।

অমর — লালা উত্তমচাঁদ আমাকে পাঠালেন। আজ দুপুবে লালাজীব গদীতে দয়া কবে থাবেন। সেখানেই তাঁব সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে।

রণজিত—লালাজীর খাস কামবাতে দেখা কবব। কেউ যেন না থাকে, খুব হুসিয়াব। আজ যে জন্য দেখা করতে যাচ্ছি তা মাল খালাসেব ব্যাপার নয়, জীবন খালাসীব ব্যাপাব। আজীবন খালাস হয়ে যাবে অমবনাথ, তাবই আয়োজন আজ। জানো, নেতাজী কাবুলে পৌঁছেচেন।

অমর — [চমকাইয়া] নেতাজী?—

কি বললেন?—মানে আমাদের নেতাজী! সুভাষচন্দ্র?

রণজিত—হ্যাঁ সুভাবচন্দ্র।

অমর — নেতাজী কাবুলে? কথন এলেন? কেমন করে এলেন? কোথায় তিনি?

বণজিত— আস্তে কথা কও অমবনাথ। সবই বল্‌চি, একটু আস্তে। কথাটা ঘুর্ণাক্ষবেও কেউ না জানে।

অমব — বলেন কি সর্দ্দাবজী এ যে, কল্পনাতীত ব্যাপাব! আমি যে ভাবতেই পারচি না। আমাব বুক ঢিপ্ ঢিপ্ কবচে। না, না, ভয় নেই, আমি কাউকে বল্‌ব না। নেতাজী এসে পড়েচেন! নেতাজী, নেতাজী, আহা, কি আশাতীত সৌভাগ্য! বলুন, বলুন, সর্দ্দাবজী, তিনি কখন এলেন, কি কবে এলেন, নিবাপদে পৌছেচেন তো?

বণজিত—সবই বল্‌চি অমবনাথ। কোন্ মন্ত্রে বৃটিশ সিংহেব বজ্রমুষ্টি ভেদ কবে তিনি বেবিয়ে এলেন তাও বল্‌চি। কিন্তু মেঘ এখনও কেটে যায়নি। এখনও তিনি নিবাপদ নন্। আপ্রাণ চেষ্টা কবতে হবে তাঁব জন্য। যেমন কবে হোক তাঁকে বাশিয়ায় পৌছে দিতে হবে। অতি সন্তর্পণে, অতি গোপনে এই কাজটি সম্পন্ন কবতে হবে। খুব হুসিয়াব অমবনাথ। আনাচে কানাচে অপ্রত্যাশিত শত্রু। পদে পদে বিপদ। সাম্রাজ্যবাদী বিশাল উর্ণনাভেব কোন অদৃশ্য জালে কখন কে জড়িয়ে পড়ব ঠিক নেই। এবাব লালাজীব দেশভক্তিব চবম পবীক্ষা। তাঁকে বলো নেতাজী তাঁব জবাবেব প্রতীক্ষায় আছেন।

অমব — লালাজীকে আপনি ভাল কবেই জানেন সর্দ্দারজী। দেশের জন্য প্রাণ দিতে তিনি প্রস্তুত।—আব নেতাজীর পায়ে আমার এই প্রার্থনা পৌছে দেবেন যে অমবনাথ তাঁব গোলামেব গোলাম। নেতাজীব জন্য সে সব কবতে পাবে। উদ্‌গ্রীব হয়ে সে তাঁর আদেশেব প্রতীক্ষা কবচে।

বণজিত—সাবাস, অমরনাথ এই তো চাই। ভারতের বাইরে সুদূর কাবুলে এমন অঘটন ঘট্‌ল কি কবে? চরম বিপদের মুখে সোজা

হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েচে ভারতের যুবক তার নেতাজীর জন্য। না, আর সন্দেহ নেই, আমরা জয়ী হব। দিকে দিকে তার শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[কাবুল। লালা উত্তম চাঁদের গদী। খাস কামরায় রণজিত সিং ও লালা উত্তম চাঁদ।]

উত্তম — পাশপোর্ট নিতে রাজী হলেন না?

রণজিত—না।

উত্তম — তবে কি করে কাবুলে এলেন?

রণজিত—পাঠান সেজে হররন্সের মটরে জামরুদের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। ভগতরামও পাঠান সেজে তাঁর সঙ্গী হল। জামরুদ কেল্লার আগে বাঁ হাতি যে কাঁচা রাস্তাটা রয়েচে অই দিয়ে এগিয়ে চললেন। ও ভাবে গরহি গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছে গেলেন। সেখানে মটর রাস্তা শেষ হয়েচে বলে দলবল সহ গাড়ীটা পেশোয়ারে ফিরে গেল। সঙ্গে রইল শুধু ভকতরাম ও দুজন সশস্ত্র পাঠান।

উত্তম — গরহি গ্রাম থেকে কি ব্যবস্থা হল?

রণজিত—সেই আদিম ব্যবস্থা লালাজী। মানুষ দাঁড়াতে শিখে অবধি চলবার যে ব্যবস্থা করেচে, তাই—পায়ে হাঁটা।

উত্তম — কি সর্ব্বনাশ!

রণজিত—সেই সময় থেকেই নেতাজী কালা বোবা সাজলেন, কথা বললেই ধরা পড়বেন তাই। তারপর পায়ে হেঁটে দিনরাত পথ চলে একদিন ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে এলেন।

উত্তম — এই দুর্জ্জয় শীতে, এই বরফ ভেঙে, কি করে আসতে পারলেন তিনি?

রণজিত—ভাবতে পারো লালাজী? শুধু নিজেই নয়, সঙ্গী তিনটীকেও চালিয়ে নিয়ে এলেন। নইলে বলছি কি?

উত্তম তারপর?

রণজিত - তারপর আড্ডা শরিফ পৌছুলেন। আড্ডাশরিফের পীর দেখতে দেখতে নেতাজীর দোস্ত হয়ে গেলেন। গলাগলি ভাব। পীর সাহেব খুব যত্ন করে তাঁকে রাখলেন। দুদিন সেখানে বিশ্রাম করে নেতাজী আবার বেরিয়ে পড়লেন। পাঠান রক্ষী দুটিকে খবর দেবার জন্য ফিরে পাঠিয়ে দিলেন। ভগতরাম নাছোড়বান্দা কিছুতেই নেতাজীর সঙ্গ ছাড়ে না। কাজেই তাকে সঙ্গে নিতে হল। পীর সাহেবও কিছুতেই মানলেন না। তিনটি নূতন পাঠান সঙ্গে দিলেন। আড্ডাশরিফ থেকে রাস্তাটা বড় দুর্গম হয়ে উঠল। বিশ্রামের জায়গা নেই বলে তাড়াতাড়ি ওটা পেরিয়ে আসবেন বলে দ্রুত চলতে লাগলেন। শেষে লাফিয়ে, হামাগুড়ি চড়াই উৎরাই করে করে নাভিশ্বাস হয়ে লালপুরায় পৌছুলেন। সেখানে হাত পা ছেড়ে দিয়ে, ক্লান্তদেহে মাটিতে লুটিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে তাঁর দ্বারা আর হবে না। একটা বাহন যেমন করেই হোক যোগাড় করতেই হবে। সবারই তখন অন্তিম অবস্থা কে কাকে দেখে?

উত্তম — [উর্দ্ধশ্বাসে] তারপর, তারপর?

রণজিত—লালপুরার মালিক খান্ সাহেব। মস্ত তার প্রতিপত্তি, জবরদস্ত

প্রতাপ। সঙ্গী একজন পাঠান বক্সী টলে টলে উঠ্‌ল। এক মাইল পথ হেঁটে গিয়ে খান্ সাহেবের দোরে ধরনা দিয়ে পড়ল। খান্ সাহেবের দয়া হল তিনি ওদের আনিয়ে নিলেন। নেতাজীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হতেই তাদের ভাব হয়ে গেল। নেতাজী খান্ সাহেবের অতিথি হলেন, তাঁর আশ্রয় পেলেন।

উত্তম — ধন্য খান সাহেব!

রণজিত—হ্যাঁ, লালাজী, ভারত কখনও খান্ সাহেবকে ভুলবে না।—খান্ সাহেবের আশ্রয় পেয়ে পথ নিরুপদ্রব হয়ে গেল। নেতাজীকে তিনি একখানা ছাড়পত্র লিখে দিলেন। তাতে এই লেখা রইল যে "জিয়াউদ্দিন ও রহমত খাঁ আমারই প্রজা। তারা সখী সাহেবের দরগায় তীর্থ করতে যাচ্ছে। তাদের সব কাজ কর্ম্মের জন্য আমি দায়ী রইলুম। তাদের উপর অযথা উপদ্রব না হয় সেজন্য এই ছাড়পত্র লিখে দিলুম।"

এম্নি করে লালপুরার খানের আশ্রয়ে পথ সুগম হয়ে গেল, ধীরে ধীরে কাবুল নদী পেরিয়ে এলেন। তারপর মোটর রাস্তায় এসে কাবুল যাত্রী একটা মালের লরী ধরলেন। দুটিদিন সেই লরীতে বস্তা, বাক্স এটা সেটার শীর্ষে শোভমান হয়ে ব্যালান্স রক্ষা করে করে, প্রাণ বাঁচাতে বাঁচাতে ও পথতরুর শাখা আলিঙ্গন এড়াবার চেষ্টা করতে করতে প্রাণখানি সমেত কোনোমতে কাবুলে এসে পৌঁছে গেলেন। পথে দু'জায়গায় খান সাহেবের ছাড়পত্রটী দেখিয়ে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেলেন।

উত্তম — সর্দ্দারজী! এযে অতুলনীয়। ত্যাগে বীর্য্যে, সাহসে, বুদ্ধিমত্তায় এযে চিরদিন উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে থাকবে। হায়, দেশের জন্য কি না করতে হল! স্বদেশপ্রেম কি বস্তু আমরা এখনও

কি তা জেনেচি? নেতাজীব নাম কত শুনেচি, আজ এ অপূর্ব্ব কাহিনীও শুন্‌চি। আমার ভরসা হচ্ছে আবার ভারত স্বাধীন হবে। ভাঙ্গা মনে আব একবাব আশা উৎসাহ জেগে উঠ্‌চে। আমাব ভেতব থেকে কে যেন বল্‌চে প্রতাপ, শিবাজীব শূন্য আসনেও উত্তবাধিকাব নিয়ে তিনি এসেচেন। তাঁব আদেশ উত্তম চাঁদেব শিবোধার্য্য। অমবনাথ বলছিল নেতাজীকে রুশিযায় পৌছে দিতে হবে। তাই হবে সর্দ্দাবজী। যেমন কবে হোক্ রুশিয়া যাবাব বন্দোবস্ত আমি কবে দেব। আজই রুশিয়াব লিগেশনে খবব দিচ্ছি।

বণজিত—সে কি আব বাকী আছে লালাজী? কাবুলে এসেই রুশিযাব লিগেশনে ভগতবাম ছুটোছুটি কবচে। কিন্তু ওদেব ব্যবহারটা গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। নেতাজীব চিঠিব ওবা জবাব দেযনি, বললে, "মস্কোতে লিখেচি, জবাব এলেই খবর দেব।" জবাবেব জন্য বোজই ভগতবামকে নিয়ে নেতাজী লিগেশনের আশে পাশে ঘুবোফিবি কবচেন। কিন্তু সঙ্কেতস্থলে কেউ আস্‌চে না, লিগেশনে ঢুকবাব অনুমতি পর্য্যন্ত দিচ্ছে না। কাল বিকেলে রুশিয়ার রাজদূত মোটবে কোথায যাচ্ছিল। ভগতরাম মবিয়া হয়ে মোটব আটকে ফেল্‌লে। গালাগাল অগ্রাহ্য করে চুপি চুপি ভদ্রলোককে বললে, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস্ আপনার সঙ্গে কথা বলবাব জন্য ব্যস্ত হয়েচেন, ঐ দেখুন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।" নেতাজী পাঠানেব ছদ্মবেশে ছিলেন। ব্যাটা একবার নেতাজীর দিকে তাকায়, আবার কি ভাবে। শেষে বললে, "ওটিযে সুভাষ চন্দ্র বোস তার প্রমাণ কি?" বলেই ড্রাইভারকে গাড়ী চালাতে ইসারা করলে।

উত্তম — হুঁ।—

রণজিত—কি ভাবচ লালাজী ?

উত্তম — ভাবচি, এর পরেও রাশিয়া যেতে চান্ ?

রণজিত—আমিও ভেবে দেখেছি লালাজী। কিন্তু নেতাজী বলচেন যেতেই হবে।

উত্তম — [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া]
একটা কথা ভেবে দেখেচ সর্দ্দারজী ? রুশিয়ার রাজদূত নেতাজীর সঙ্গে দেখা করেনি বটে, কিন্তু ইংরাজকেও তো সে কিছু জানায়নি। নেতাজী কাবুলে আছেন এই সংবাদটী ইংরেজের কাছে কত মূল্যবান্ রুশিয়া কি তা জানে না ?

রণজিত—তুমি কি বলতে চাও লালাজী, আজও খবরটা দেয়নি বলে কাল ও দেবে না ? ঐ ছোট্ট কথাটার উপর নির্ভর করে থাকা চলে ?

উত্তম — চলে না রণজিত সিং। আর ঠিক সেই জন্যই রুশিয়া জানুক যে তিনি মস্কো যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে কাবুলে অপেক্ষা করচেন। নইলে ইংরেজকে জানিয়ে দিতে ওরা একমুহূর্ত্ত বিলম্ব করবে না। ওটা সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে সর্দ্দারজী। রুশিয়া ভাবচে তাঁকে হাতের মুঠোয় পেয়েচে, মহামূল্য সংবাদটি উদ্যত করে তাঁর কাছে সে যা খুসী আদায় করতে পারবে।—আমরাও দেখে নেব সর্দ্দারজী। আমি ইটালীর দূতাবাসে সিনর কারোনীর সঙ্গে এখনই দেখা করতে চললুম। নেতাজীকে বলো।—
অমরনাথ ?

[অমরনাথের প্রবেশ]

অমরনাথ, তুমি মহাফিবকে খবর দাও আমার সঙ্গে আজই দেখা করা চাই।

তৃতীয় দৃশ্য

[কাবুলের ভগ্ন সরাই। একটা অন্ধকার কুঠুরীতে পাঠানবেশে সুভাষচন্দ্র ও ভগতরাম]

সুভাষ — ব্যাপারটা যে ঘোরালো হয়ে উঠ্‌ল ভগতরাম!

ভগতরাম—আজ্ঞে?

সুভাষ — ব্যাটা যে পেছন ছাড়ে না!

ভগতরাম—হা, হা, হা।

সুভাষ — হাস্‌চ যে?

ভকতরাম—কথায় বলে বোবার শত্রু নেই। এযে দেখছি ভরসাও নেই। বোবা, কালারও শত্রু জুটে যায়।

সুভাষ — তাই বুঝি হাসি পাচ্ছে? রোসো মজা দেখাচ্ছি।

[কপট রোষে লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইলেন]

ভগত — দোহাই নেতাজী, ওটি নয়, ওটি নয়। ঐ গুণ্ডার হাতে মহা-যষ্টিটি উঠ্‌লে মজার ভরসা যদি বা পাওয়া যায় প্রাণের ভরসাটা ছাড়তে হয়।

সুভাষ — [কপট গাম্ভীর্য্যে] সাবধান, আর হাসবে না।

ভগত — গোয়েন্দাটার সঙ্গে কেমন অভিনয় করলুম বলুন তো!

সুভাষ — হ্যাঁ, তা একরকম চলনসই গোছের হয়েচে বলতে হবে।

ভগত — গোয়েন্দাটা এসে বললে, "পূরো ছ'দিন তোমাদের লিগেশনের দিকে ঘুরোফিরি করতে দেখলুম। তোমাদের মতলব টা কি? তোমরা কে? সরাইতে এত দিন পড়ে আছ, খাবার কিনে খাচ্ছ, কাবুলে জানাশুনো কেউ নেই নাকি? তবে কাবুলে পড়ে আছ কেন?"

সুভাষ — তুমি বোধ করি এমন ভাব দেখালে যে লিগেশন্ কি বস্তু, বাঘ না ভালুক, তা সাতজন্মে জানো না!

ভগত — তা নয় তো কি! লিগেশন্ আবার কি চিজ্ রে বাবা! অজ পাড়াগাঁর পাঠান রহমত খাঁ। সে ওসবের জানে কি? বললুম, "আমরা লালপুরা মুল্লুকের খাঁ সাহেবের প্রজা, সখী সাহেবের দর্গায় যাচ্ছি। ওটি আমার দাদা জিয়াউদ্দীন, বোবা ও কালা, ইদানীং আবার অসুখেও ভুগ্‌চে। ওর জন্য দর্গায় সিন্নী মানত করেচি। দোহাই হুজুর আমাদের উপর নারাজ হবেন না।"

সুভাষ — তা অভিনয় টাতে নিশ্চয়ই গলদ হয়েছিল। নইলে দশটাকা ঘুষ দিতে হল কেন?

ভগত — কি করবো? ব্যাটা বললে, "ও সব বিশ্বাস করি না। চল তোমাদের থানায় নিয়ে যাব।" আমি বললুম, "এই দেখ খান্ সাহেবের ছাড়পত্র, স্বয়ং খান্ সাহেব সই করে দিয়েছেন। লাল-পুরার খান্ সাহেবের নাম শুনেচ তো? বেশী চালাকি করো না। পাড়াগাঁর লোক বলে হাতেই তুলতে চাওনা, না?" আড় চোখে চেয়ে দেখলুম ব্যাটা ছাড়পত্রটা পড়ে যেন একটু দমে গেল। তখন সুযোগ বুঝে বললুম, "তোমার মেহন্নতের জন্য তোমায় কিছু দিচ্ছি, আমাদের আর হয়রাণ করো না। খোদা-তাল্লার মরজী! সখীসাহেব গিয়ে যা খরচ করতুম তার থেকে না হয় তোমাকেও কিছু দিলুম।" দশটা টাকা হাতে পেয়ে লোকটা সেলাম করে চলে গেল।

সুভাষ — সেলাম করে চলে গেলোই বটে! জানিয়ে গেল যে ঐ সেলামের সুদ উশুল করতে আবার আসবে।

ভগত — তাই বই কি? তিনদিন তো আর এ মুখো হয় নি?

সুভাষ — কিন্তু তিনদিন পরে তো ফের এলো, তার কি?

ভগত — আচ্ছা বলুন তো কি করে জানবো দশদিনেও আপনার মস্কোর খবর আস্‌বে না ?

সুভাষ — তোমাকে কি কেউ হাত গুণে বলে দিয়েছিল নাকি যে দশ দিনের মধ্যেই মস্কোর খবর এসে যাবে ?

ভগত — তা বলে নি।

সুভাষ — তবে ?

ভগত — [একটু থামিয়া নিম্নস্বরে] কি হবে নেতাজী ?

সুভাষ — কি আবার হবে ?

ভগত — তিনদিন পরে কাল ব্যাটা আবার এসেছিল। পাঁচটাকা ঘুষ দিয়ে বিদেয় করেচি। আবার যদি আসে ?

সুভাষ — আবার কিছু দিলে চলবে না ?

ভগত — কিন্তু এবার কৈফিয়তটা কি দেব ? অমরনাথের ওখান থেকে ফিরে এসে যে দৃশ্য দেখলুম, একেবারে চক্ষুস্থির ! ব্যাটা আমার জন্য অপেক্ষা করচে, আর আপনি বোবা কালা সেজে বসে আছেন, পরম নির্ব্বিকার !

সুভাষ — [হাসিয়া] নির্ব্বিকার না ? ব্যাটা পুস্ত ভাষায় কি বলতে সুরু করলে। আমি হাত মুখ নেড়ে জানিয়ে দিলুম আমি বোবা কালা। তবু লোকটা নড়ে না। তোমার সঙ্গে কি যে ভালবাসা তোমাকে না দেখে যাবেই না। বসেই রইল।

ভগত — মুখে আগুন ! আমি আসতেই বলে, "কি হে তোমরা সখী সাহেব যাবার বাস্‌ এখনও পেলে না ?" কেমন চট্‌ করে জবাব দিলুম ! "পেলে কি আর বসে আছি গো ? এইমাত্র বাস্‌ ষ্ট্যাণ্ড থেকেই তো আস্‌চি।" বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

সুভাষ — আবার এলে না হয় বুদ্ধি করে আরেকটা কিছু বলবে ? পারবে না ?

ভগত — তাই বইকি! আবার এলে কথাটি নয়, ঠেঙিয়ে টিট্ করে দেব। বাছাধন ঘুঘু দেখেচেন, ফাঁদ দেখেন নি।—
আমার একটা কথা শুনবেন নেতাজী? আপনি রুশিয়ার সঙ্গ ছেড়ে দিন। যত দিন যাচ্ছে, ততই একুল ওকুল দুকুলই নষ্ট হবার উপক্রম হয়েচে। ধরা পড়বার আশঙ্কা দিন্ দিন বেড়ে যাচ্ছে। রুশিয়ার ভরসায় বসে থাকলে আর চলবে না। অন্য উপায় স্থির করুন।

সুভাষ — তাইতো ভগতরাম! আমি রুশিয়ার উপর নির্ভর করেই এতটা পথ এগিয়ে এলুম। সময় বয়ে যাচ্ছে। একবার যখন পা বাড়িয়েছি রুশিয়ার ভরসা যদি ছাড়তেই হয় তবু তো ফিরে যাবার উপায় নেই। ভারতের স্বাধীনতা লক্ষ্য করে অকূলে ঝাঁপ দিতে হয়, তাই দেব। যা হবার হোক। আমি এগিয়েই চল্‌ব। বিপ্লবের অগ্নিশিখা যেখান থেকে হোক, যতটুকু হোক আহরণ করে আনবো। তার আগে পরাধীন ভারতে আর ফিরে যাবো না।

[বাইরে দরজায় প্রবল মুষ্ট্যাঘাত ও কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার--
রহমত খাঁ, হাই রহমত খাঁ!]

ভগতরাম দরজা খুলিয়া দেখিল গোয়েন্দা। ভগতরাম বিপন্ন দৃষ্টিতে সুভাষের দিকে চাহিল। সুভাষ বোবা কালা সাজিয়া পরম নির্ব্বিকার।]

ভগত — [জোর করিয়া হাসি টানিয়া] এই যে, এযে হুজুর দেখ্‌চি। আসুন, আসুন, হুকুম ফরমাস করুন।

গোয়েন্দা—[প্রবেশ করিতে করিতে] বলি ব্যাপার খানা কি হে? হ্যাঁ?

ভগত — [হাত কচ্‌লাইয়া] কিসের ব্যাপার হুজুর?

গোয়েন্দা,—[ভ্যাঙচাইয়া] কিসের ব্যাপার হুজুর! কচি খোকা! কিছুই জানে না! চল্ থানায়।—

ভগত — [পকেট হইতে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া] কি হয়েচে হুজুর?

গোয়েন্দা—[ছোঁ মারিয়া নোটটি পকেটস্থ করিতে করিতে] সখী সাহেব যাবার বাস সবাই পাচ্ছে, কেবল তোমরাই পাচ্ছ না, না?

ভগত — পেলে কি আর—

গোয়েন্দা—[মুখ খিঁচাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া] পেলে কি আর—কাল একটা বাস সখী সাহেব গেচে। সবাই আব্দুর রহমানের কাছে বাস্ ষ্ট্যাণ্ড আমি নিজেই খোঁজ নিয়েছি। কাল একটা বাস্ সখী সাহেব গেছে সপ্তাহে দুদিন করে মেল্ও সখী সাহেব যাচ্ছে।—

বেইমান, কমবক্ত, সখী সাহেব যাবার বাস পাচ্ছ না! সেজন্য কাবুলের সবাইযে পড়ে আছ? ধাপ্পা বাজীর আর জায়গা পাওনি? চল্ থানায়।

ভগত — দোহাই হুজুর। খোদার দৌলতে আপনার বাদশাহী পয়দা হবে হুজুর। আমরা বিদেশী লোক। সপ্তাহে দুদিন করে মেল্ যে সখীসাহেব যায় সে কথাটা তো জানিনে হুজুর। ইয়া আল্লা, কি আর বল্‌ব হুজুর, আব্দুর রহমানের বাস ষ্ট্যাণ্ডে আমাকে কেউ বলে নি যে বাস্ সখীসাহেব যাচ্ছে। তা'লে কি আর বসে থাকি? সব ঝুটা আদমি মা'লিক, সব ঝুটা। এক ড্রাইভার সাহেবকে দুটো টাকা দিয়ে বলেছিলুম আমাকে সখী সাহেবের বাস ধরিয়ে দিতে। সে বললে, "জরুর ধরিয়ে দেব। তুমি রোজ সকালে বাস্ ষ্ট্যাণ্ডে এসে আমার খোঁজ করো।" রোজই ষ্ট্যাণ্ডে যাই, তার সঙ্গে কখনও দেখা হয়

কখনও হয় না। রোজই বলে বাস পাওয়া গেল না। পাড়াগাঁর মুখ্যু লোক দেখে সবাই ঠকিয়ে যায়। হুজুরের কাছে এবার ঠিক খবর পেলুম। ইন্‌সাল্লা, এবার সখীসাহেবের বাস্ আর ফসকাবে না।

গোয়েন্দা—বটে, বটে একটা ড্রাইভার কে না হক্ দুটো টাকা দিলে, আর আমার বেলায় যত কিপ্‌টেমি? না, না, আমি তোমাদের কোনো কথা শুনবো না, তোমরা বদমাস্, ডাকু, লে, লে, হট চল্ থানায় চল্।

ভগত — [পকেট হইতে অন্য একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া গোয়েন্দার হাতে দিয়া] হুজুর গরীব আদমী। দেবার সামর্থ্য থাকলে আপনাকে দেই না হুজুর? এই নিয়ে আমাদের রেহাই দিন্ হুজুর। আমাদের জন্য এত মেহান্নত করলেন, নিজে বাস্ ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে খবর পর্য্যন্ত নিলেন, কত সৌজন্য দেখালেন, আমাদের সাধ্য কি যে মূল্য দিয়ে পরিশোধ করি। খোদার দৌলতে আপনার আমিরী হবে।

গোয়েন্দা—আপাততঃ তোমাদের দৌলতে আরো কিছু যে হওয়া প্রয়োজন হে!—লালাপুরার লোকগুলো ব্যবহার জানে, মান্‌চি। কিন্তু মাসে সতের টাকা মাইনে পাই, আমার ওতে কি করে চলে? আরো কিছু বার কর নইলে থানায় নিয়ে যাব, সাফ কথা বলে দিলুম।

ভগত — আর যে কিছুই নেই হুজুর। একেবারে হাতখালি। দয়া করুন হুজুর।

গোয়েন্দা—তবে থানায় চল। লালপুরের খাঁ সাহেবকে থানায় বসে টাকার জন্য লিখবে না হয়! সে বেশ হবে, থানায় বসেই লিখবে, হেঃ, হেঃ, হেঃ।

ভগত — বলতে পারলে ? ও কথা বলতে পারলে আগা সাহেব ? দশটা টাকা পকেটস্থ করে অম্লান বদনে বলে ফেল্‌লে থানায় নিয়ে যাবে ?

গোয়েন্দা—হ্যা বললুমই তো। আবো টাকা বার কর, নইলে থানায় নিয়ে যাবই।

ভগত — ভারি ইয়ে পেয়েচ যে দেখচি। বলচি আব টাকা নেই, কথাটা কাণে গেল না, না ?

গোয়েন্দা—ব্যাটা মানুষ চডিয়ে খাই। টাকা কাব আছে কাষ নেই আমি জানি নে ? টাকা নেই ! যতক্ষণ না বামগুঁতো পিঠে পড়ে, ততক্ষণ সবাই ও বুলি কপ্‌চায়। চল্, থানায় চল্ ছাডব না।

ভগত — [পকেট উল্টাইয়া দেখাইতে লাগিল] এই দেখ, এই দেখ— পকেটে টাকাব গাছ আছে কিনা ! সেদিন দশ টাকা নিলে, কাল পাঁচ টাকা নিলে, আজও দশটাকা নিলে, কম নিয়েচ ? তবু তোমাব পেট ভরে না ! বল্‌চি আব নেই। টাকা আশমান থেকে গডায নাকি ?

গোয়েন্দা আলবৎ গড়াবে। জিয়াউদ্দীনের হাতে ওটা কি চিক্ চিক্ কবচে ?

ভগত — কি ?

গোয়েন্দা—দেখতো ওটা কজ্জে ঘড়ি না ? দামী বলেই তো বোধ হচ্ছে।

ভগত — বটে রে টীক্‌টিকি, আস্পর্দ্ধা কম নয়। ঐ কব্জি ঘড়ি হাত থেকে খুলে তোমাকে দিতে হবে। বেরো, বেরো,চামচিকে হারগিলে, শকুনির বাচ্চা ! আর কথাটি নয় [লাঠি তুলিয়া লইল]

গোয়েন্দা—[পিছন হটিতে হটিতে] চল্, থানায় চল্, ব্যাটা এখখুনি লোক নিয়ে আসছি হাতকড়া দিয়ে-পিট মোড়া কবে বেঁধে, বেত মেরে মেরে থানায় নিয়ে যাব।—

ভগত — দাঁড়া, নিমকহারাম, বেইমান, যাচ্ছিস কোথায় ? লোক নিয়ে আসা বার করচি। আমার টাকা যা নিয়েচিস, সব গুনে দিয়ে যা। তার আগে ঘর থেকে বেরোতে দেব না। [দরজা বন্ধ করিয়া আগলাইয়া দাঁড়াইল।]

গোয়েন্দা—সাবধান ! ভাল হবে না বল্‌চি। পথ ছেড়ে দে, নইলে এক্ষনি চেঁচামেচি করে লোক জড় করব।

ভগত — তবে রে বিট্‌লে, চেঁচিয়ে লোক জড় করবে বার করচি।—
[ছোরা বাহির করিয়া] জলদি টাকা ফেল, বলচি। নইলে, আগে তোর জিভ্‌ কাট্‌ব, তারপর মিটমিটে চোখ দুটো উপড়ে নেব, তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে এই ঘরে ফেলে রেখে যাব।—

গোয়েন্দা—[সভয়ে পিছু হটিতে হটিতে] সাবধান আর এক পা এগিয়েচিস্‌ কি মরেচিস্‌,—মেরে ফেলব, খুন করে ফেল্‌ব ;—

ভগত — এই তো এগোলাম। কি করবি কর।

গোয়েন্দা—[দ্রুত হটিতে হটিতে] আর এক পা এগিয়ে দেখ না ?— ভালো হবে না বল্‌চি,—

সুভাষ — [অকস্মাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও লাঠিটা মাটিতে ঠুকিয়া গোয়েন্দার মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন,]
ব্‌, ব্‌ ব্‌............!

গোয়েন্দা—[হাল ছাড়িয়া দিয়া] এঁ্যা, এঁ্যা, ওরে বা-প্‌-রে, ওটা আবার কিরে, গেলুম, গেলুম, খুন করে ফেল্‌লে [ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চিংড়ি মাছের মত লাফাইতে লাগিল]

সুভাষ —[পালোয়ানের মত বুক ঠুকিয়া ডান হাত দিয়া বাঁ হাতের কব্জি তুলিয়া ধরিলেন ও একটানে রিষ্ট ওয়াচ খুলিয়া লইয়া

মিলিটারী কেতায় গোয়েন্দার সামনে সেটা ধরিলেন]

বুঁ, বুঁ, বুঁ·········· ·!

গোয়েন্দা—[কিছুক্ষণ মিট্‌মিট্‌ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বুঝিল সুভাষ তাহাকে রিষ্ট ওয়াচটা দিতেছেন। কাঁপিতে কাঁপিতে এদিক ওদিক চাহিয়া, এক পা অগ্রসর হইয়া এক পা পিছাইয়া অবশেষে রিষ্ট ওয়াচটা সুভাষের হাত হইতে তুলিয়া লইল। স্বস্তিব নিশ্বাস ছাড়িয়া]

তাই বল। দেখ তো মিছামিছি কত কষ্ট পেলে। ওটা আগে দিলেই হোত আমাকে চেনো নাতো, বাগলে আমাব জ্ঞান থাকে না। একটা ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলতাম। যাক্‌ নারাজ হয়ো না জিয়াউদ্দিন মিঞা, তুমি ভালো লোক। কিন্তু ওটা বদমাস্‌। ওটাকে আমি ছাড়ব না। লোক ডেকে ওটাকে আমি সায়েস্তা করব। বেয়াদব, আমার খাতির জানে না।—

সুভাষ —[ম্যাজিক দেখাইবাব মত করিয়া হাত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পকেট হইতে সাতটা টাকা বাহিব করিয়া মিলিটাবি কেতায় গোয়েন্দাব সামনে ধবিলেন]

বুঁ, বুঁ, বুঁ······ ··।

গোয়েন্দা—[একগাল হাসিয়া টাকা তুলিয়া লইয়া] ও, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি খাসা লোক, বড্ড ভালো লোক, জিয়াউদ্দীন কেয়াবাত!— এ্যাও রহমত! বেয়াদবী এবার মাপ করলুম, কিন্তু ভবিষ্যতে আব মাপ করবো না বলে রাখলুম। তুমি বেয়াদবী করেচ, বেশ একটু বেয়াদবী করেচ। সাবধান!—এবার মাপ করলুম। আলেকম্‌ সাল্লাম্‌ জিয়াউদ্দীন সাহেব।

[সাহ্লাদে দরজা খুলিয়া প্রস্থান।]

সুভাষ —[দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া] আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। চলো

উত্তমচাঁদের বাড়ী। এমন জায়গা খুঁজে নিতে হবে, যেখানে ব্যাটা আর দেখা না পায়।

ভগত — [হাসিতে ফাটিয়া পড়িল] পায়ের ধূলো দিন গুরুজী? বুঁ, বুঁ, বুঁ!

চতুর্থ দৃশ্য

[কাবুল। লালা উত্তমচাঁদের বাড়ী। দোতলার ঘরে পাঠান বেশী সুভাষচন্দ্র ও ভগতরাম।]

সুভাষ — ভগতরাম, ওরফে রহমত খাঁ. আজ চল্লিশ দিন এই বাড়ীতে লুকিয়ে আছি। লালাজীর আতিথ্যে ভুঁড়ি বাগানো ছাড়া আর কোনো কাজ যে এগোচ্ছে না, তার কি?

ভগত — তাইতো নেতাজী, এযে বড়ো অস্বস্তিকর।

সুভাষ — রেডিওতে শুনেচ তো? সুভাষ চন্দ্র ধরা পড়েচে?

ভগত — হা, হা, হা, তাই নাকি?

সুভাষ — এ যে আরো অস্বস্তিকর ভগতরাম।

ভগত — হা, হা, হা, এত দিনে দুষমনগুলো বুঝেচে যে সুভাষ বোসকে আর ধরা যাবে না।

সুভাষ — এখন বলতো, আমি সত্যি না আমার মিতেটি সত্যি। রুশিয়া কি করে জানবে ঝুটা সুভাষ ধরা পড়েচে আর আসল সুভাষ কাবুলে আছে?—কি গম্ভীর হয়ে গেলে যে?

ভগত — কি হবে নেতাজী? রুশিয়া মস্ত একটা অজুহাত পেয়ে গেল। এখন বেপরোয়া হয়ে আরো কতদিন ঝুলিয়ে রাখবে কে জানে!

সুভাষ — অন্তিম চিকিৎসা করেচে ভগতরাম, ইংরেজ তার শেষ কামড়টি জুতসই করেই দিয়েচে। ধূর্ত্ত শৃগাল বুঝেচে যে সুভাষ তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। তাই কপাল ঠুকে শব্দভেদী বাণটি ঠিক ছেড়েচে। আর সুভাষ প্রতিপন্ন হলে যদি কোথাও আমার কোনো কাজ পণ্ড হবার সম্ভাবনা থাকে তবে সেটুকুই বা বাকী রাখে কেন ?

ভগত — এই বিটুলে গুলোকে হাত পা বেঁধে জলবিছুটি দিলে গায়ের জ্বালা কমে।

[উত্তম চাঁদের প্রবেশ]

সুভাষ — কিছুমাত্র ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই লালাজী, আতিথ্যের একবিন্দুও ত্রুটি হচ্ছে না। তোমার ছোট্ট মেয়েটি যখন বেণী দুলিয়ে এটা খাও ওটা খাও করে সবটুকু খাইয়ে ছাড়ে তখন মনে হয় কলকাতায় রমা আমাকে এম্নি করে খাওয়াচ্ছে। এত আদর যত্ন এইটুকু বয়েসে কোথা থেকে শিখেচে! ওর মায়ের কাছে নিশ্চয়।

উত্তম — গরীবের কুঁড়েতে যখন এসে পড়লে নেতাজী তখন ক্ষুদ কুঁড়ো দিয়ে যা হোক ক্ষুন্নিবৃত্তি তো করতেই হবে। রাজপুত্র যখন প্রাসাদ ছেড়ে ধুলোয় নেবে এলেন তখন সাধ্য না থাকলেও নিজের ঘরে তাঁর পায়ের ধুলো পাবার প্রবল লোভটা যে কিছুতেই সামলানো যায় না।

সুভাষ — অন্তরের দাক্ষিণ্য যে রাজধানী উত্তমচাঁদ। তোমার সহৃদয়তা তাকে ঐশ্বর্য্যে ভরে দিয়েচে। অভাব সেখানে থাকবে সাধ্য কি ?

[রণজিতের প্রবেশ]

এই যে রণজিত সিং। মুখ দেখে মনে হচ্ছে আজও বিশেষ সুবিধে হয় নি। রুশিয়া কি বলচে ?

রণজিত—নূতন কিছুই বলচে না নেতাজী। মস্কোব নির্দ্দেশ এখনও পায নি, এই কথাই বললে। রুশিয়া যে ও রকম করবে তাতো বুঝতে পারি নি। আমাকে মস্কোতে ডেকে পাঠিয়েছে অথচ আপনাকে কিছুই বল্‌চে না। এর মানে কি ? ওদের মতলব টা কি ?

সুভাষ — মতলব গুরুতর।—এখন বলতো অ্যান্টি ইণ্ডিয়া রেডিও যে খবর দিলে সুভাষ চন্দ্র বসু ধরা পড়েচে তার মতলবটা কি ?

রণজিত—হা, হা, হা, তাই নাকি ? খুব ইয়ারকি করেচে তো ? হা, হা, হা।

সুভাষ — হাসচ ? আমার যে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সভাৎ করে সুভাষ একটা জন্মাল কি করে ? আর আমিই বা কে !

রণজিত—হা, হা, হা, দুষ্‌মণের গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বাবা। এতদিনে তারা সুভাষ বোস্‌কে জেলে পুরবার আশা ছেড়েচে। তারা আকাশ পাতাল ভাবচে, আর ভাবচে যে সুভাষ চন্দ্র আবার কোনদিক থেকে কবে উঁকি মারবে।

[সকলের হাস্য]

সুভাষ — তোমার নীচের তলার ভাড়াটাদের খবর পেলে উত্তমচাঁদ ?

উত্তম — হ্যাঁ, অমর নাথ আজ ওকে খুঁজে বার করেচে। [ডাকিলেন] অমর নাথ !

[অমরনাথের প্রবেশ]

অমরনাথ, নেতাজী আমার ভাড়াটের কথা জিজ্ঞাসা করচেন।

অমর — নীচের তলার ভাড়াটের কথা বলচেন ? ওর খবর আজ পেয়েচি। দোতলার বারান্দায় হঠাৎ নেতাজীকে দেখতে পেয়ে লোকটা একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল। এমন চমকে উঠেছিল যে ছুটে কোনমতে ঘরে গিয়ে "আমার বুক কেমন করচে" বলে

ফিট্ হয়ে গিয়েছিল। আজও তার স্নায়ুগুলো স্বাভাবিক হয়নি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এখনও মাঝে মাঝে ভুল বকে। তার স্ত্রী ঘটনাটার আভাস পেয়ে তাকে নিয়ে অন্য বাড়ীতে উঠে গেছেন। স্ত্রীর পরামর্শেই ঠিকানাটা আপনাকে দেয় নি। আমি খুঁজে খুঁজে বাড়ী বার করলুম, খবর সব নিলুম। দশ বারো দিন বাড়ী থেকে বেরোতে পাববে না। ততদিন নিশ্চিন্ত থাকুন।

সুভাষ — ওটাত নিশ্চিন্ত হবার কথা নয় অমর নাথ। লোকটার অসুখ বেড়ে গেলে তার স্ত্রী উন্মাদের মত আমায় ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। সে বড় বিপদ হবে। ওর অসুখটা যাতে বেড়ে না যায় তাই এখন সর্ব্বাগ্রে করতে হবে। ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে একটু ঠাণ্ডা রাখা দরকার। লালাজী তোমার স্ত্রীকে নিয়ে তুমি এবার যাও।

উত্তম — তাই হবে নেতাজী। আমার স্ত্রী ইতিমধ্যেই ওদের কিছু ঠাণ্ডা করেচে। অন্য বাড়ীতে উঠে গিয়ে পরদিনই ওর স্ত্রী এসেছিল। আমরা তখন সিনর কেরোনীর ঘরে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছি। আমাব স্ত্রী ওকে সারা বাড়ী ঘুরিয়ে দেখালে ও বললে যে আপনারা চলে গেছেন। ওর স্বামীর অদ্ভুত ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়েই আপনারা লাঘমানে ফিরে গেছেন এই সে ইঙ্গিত করলে। আপনারা যে লাঘমানের মস্ত ব্যবসায়ী, আর ও ভাবে চলে যাওয়াতে আমার ব্যবসার কত ক্ষতি হয়েছে তাও সে বললে। তাতেই ও তরফ এখন ঠাণ্ডা হয়ে আছে।

সুভাষ — কোনঠেঁসা করেচে লালাজী, রুশিয়া আমাকে কোনঠেসা করে ধরেচে। আজ চল্লিশ দিন ফেরারী আসামীর মত গর্ত্তে লুকিয়ে আছি। কি অদৃষ্ট! কাবুলে ছুটে এসে তবু কলকাতার জেল পেছনে লেগে রইল; সেই তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে

হচ্ছে আর সময় বয়ে যাচ্ছে। না, না, এ চলবে না, পথ করতেই হবে, বেরিয়ে পড়তেই হবে। কাবুলের বালখিল্যদল ধীরে ধীরে আমায় ঘিরে ফেল্‌চে, আর ওদের উপেক্ষা করা অসম্ভব। তোমাদের পরেও বোঝা দিন দিন ভারী করে তুললুম। কাবুলে আত্মগোপন করা আর বেশীদিন সম্ভব হবে না। যে ভাবে হোক্ যে দিক্ দিয়ে হোক্ বেরিয়ে পড়তে হবে।—লালাজী! মহাফিবকে একবার লুকিয়ে আমার কাছে আন্‌তে পার?

উত্তম — আমাব মিনতি শুনুন নেতাজী, মহাফিরকে আপনার খোঁজ দেওয়া কোনোমতেই চলে না। টাকার জন্য এমন কিছু নেই যা ও পিশেচটা না করতে পারে। আমার বাড়ীর ভাড়াটে যখন এই ছদ্মবেশেও আপনাকে চিনতে ভুল করেনি তখন মহাফিরকে আমার ভরসা নেই! ব্যস্ত হবেন না নেতাজী, সিনর কারোণী ইটালীর পাশপোর্ট যোগাড় করবেই।

সুভাষ — কাবোণী তোমায় রোমেব চিঠিপত্র দেখিয়েচে?

উত্তম — হ্যাঁ, নেতাজী। রোমের চিঠিপত্র আমাকে পড়ে শুনিয়েচে। ওরা খুব চেষ্টা করচে। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন? মস্কোতেই সব গোলমাল হচ্ছে। সিনর কারোণী এতদিনে ইটালীর পাশপোর্ট নিশ্চয় পেয়ে যেত। কিন্তু কাবুল থেকে রোমে যাবার রুশিয়া ছাড়া এখন আর অন্য পথ খোলা নেই, রুশিয়া হয়েই যেতে হয়। তাই রুশিয়ার মত নিয়ে আপনাব যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। সে জন্যই যা দেরী হচ্ছে।

রণজিত—ঠিক বলেচ লালাজী, মস্কোতেই সব গোলমাল হচ্ছে। রুশিয়াব মত নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে বলে শয়তান রুশিয়া সুযোগ বুঝে একটা বড় রকমের চাল্ চাল্‌চে।

সুভাষ — হ্যাঁ রণজিত সিং, মস্কোতেই সব গোলমাল হচ্ছে। যেজন্য এখনও আমাকে ইংরেজের হাতে তুলে দিচ্ছে না, সেই জন্যই ইটালীর প্রস্তাবে ওরা বাগ্‌ড়া দিচ্ছে। আমাকে হাতছাড়া করা ওদের উদ্দেশ্য নয়। ইটালী যদি রুশিয়াকে ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল না করতে পারে তবে কিছু হবে না।

উত্তম — ইটালী একরকম করে ওকথাটা বুঝেচে বলেই মনে হল।

[রণবীরের প্রবেশ]

কি হয়েচে রণবীর ?

রণবীর— মহাফির এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

উত্তম — ডোবালে। লোকটাকে বার বার মানা করলুম আমার বাড়ীতে যেন কখনও না আসে, কোনো কারণেই নয়। তা এই তো দেখ এসে পড়েচে হারামজাদা। পাড়ার সবাই ওকে চেনে। ও যে একটা খুনে, জাহাবাজ, জোচ্চোর, পাঁড় মাতাল সবাই তাজানে। ওর সঙ্গে আমার এমন কি প্রয়োজন হয়েচে যে ও বাড়ীতেই চলে আসে সে কথা সবাই আমাকে শুধোবে। ব্যাপারটা লোকের চোখে পড়বে, নানারকমে ফেনিয়ে উঠ্‌বে। সেদিন ওকে আমার দোকানে অনেকক্ষণ বসে থাকতে দেখে আমার বন্ধুরা সব কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, বার বার জিজ্ঞাসা করেচে লোকটা ওখানে বসে আছে কেন ? আর আজ দেখ্‌চ কেমন গট্ গট্ করে আমার বাড়ীতেই চলে এসেচে ?

সুভাষ — লালাজী, ওর সঙ্গে খারাপ ব্যাবহার করো না। নিশ্চয় জরুরী কিছু বলবার জন্যই সে ওভাবে ছুটে এসেচে। তুমি ওর কথাটা আগে শোন।

[উত্তম ও রণবীরের প্রস্থান]

সর্দারজী ব্যাপটা জানো তো।

রণজিত—ম্যাপ ! হঠাৎ ম্যাপ কি হবে নেতাজী ?—ও ; বুঝেচি !—না না, এমন দুঃসাহস করবেন না। পুস্তু জানেন না, ফারসী ও শেখেন নি, পথেই ধরা পড়বেন। ও কাজই করবেন না নেতাজী।

সুভাষ — [হাসিয়া] না সর্দ্দারজী, ওসব মতলব নেই। মহাফির যেজন্য ছুটে এসেচে তার কারণ যদি ঠিক আন্দাজ করে থাকি, তবে মহাফিরের এতটা পরিচয় পেয়েও তার কথাগুলো একটু যাচাই করে না নিলে মস্ত বোকামি হবে, বুঝতে পারচ না ?

রণজিত—তা বটে !—

[ম্যাপ আনিয়া সামনে রাখিলেন।]

সুভাষ — [ম্যাপ দেখিতে দেখিতে] হুঁ, এই তো হেঙ্গো নদী। হেঙ্গোর এপারে আফ্‌গানিস্থান ওপারে রুশিয়া, নদীটা ছোট নয়। চোরাই মাল আমদানি রপ্তানি এই পথে হওয়া বিচিত্র নয়। মহাফির হয় তো ঠিকই বলেচে।—কিন্তু আফগান পুলিশের নজর এড়িয়ে কি করে লোক্ ও পারে যায় ?

[সোল্লাসে উত্তমচাঁদের প্রবেশ]

উত্তম — নেতাজী ! এতদিনে সত্যই সুসংবাদ এসেচে নেতাজী।

সুভাষ — বল, বল, লালাজী।

উত্তম — মহাফির বলচে যে হেঙ্গোনদী দিয়ে লুকিয়ে রুশিয়ায় যারা মাল-চালানের ব্যবসা করে, তাদেরই একটা আড্ডা সে খুঁজে পেয়েচে। ব্যাপারীদের একজন তার দোস্ত। লোকটি তাকে বলেচে যে হেঙ্গোর উপর দিয়ে যে সরকারি সেতুটা আছে তার অনেক দূরে একটা গুপ্ত স্থান থেকে ওরা মশকে করে নদী পার হয়। কখনও ধরা পরে নি ! এমন মশকে করেই সে মহাফিরের সঙ্গীদের পার করে দিতে প্রস্তুত আছে। যাদের পাশপোর্ট নেই,

সরকারি সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তেমন চেষ্টা মহাফিরের সঙ্গীরা যেন কিছুতেই না করে।

সুভাষ — মশক মানে তো সেই ভিস্তি ওয়ালার চামড়ার থলে, যাতে করে কাবুল নদী পার হলাম? ওতে হেঙ্গো নদী পার হওয়া যাবে?

উত্তম — বলেন কি, যাবে না? বেশ আরাম করেই যাওয়া যাবে। দশ বারোটা মশকে হাওয়া পুরে নিয়ে চামড়ার ষ্ট্র্যাপ দিয়ে কষে একঠাঁই করে বেঁধে তার উপর মাছধরা জাল টানিয়ে নিলে খুব আরাম করে ওর চেয়ে দশগুণ বড়ো নদী পেরিয়ে যাওয়া যাবে।

সুভাষ — হ্যামকের ব্যবস্থা! তবে আর কাজ কি হাত পা গুলোকে খাটিয়ে। দিব্যি আরাম করে শুয়ে শুয়ে মশকেই রুশিয়া পাড়ি দেব। এমন বাহন থাকতে কি না টানা পুলের উপর দিয়ে কেউ হাঁটতে চায়!—এখন বল তো লালাজী, হেঙ্গো অবধি পৌছুবার কি বন্দোবস্ত হবে?

উত্তম - বন্দোবস্ত এই হবে যে কাবুল থেকে নজরশরিফে অনেক তীর্থযাত্রী প্রায়ই যাচ্ছে। আপনারাও মহাফিরের সঙ্গে পাঠান সেজে তীর্থযাত্রী হবেন। তারপর নজর শরিফে রাতটা কাটিয়ে পরদিন বুখো রওনা হবেন। মহাফিরের সেই ব্যাপারী বন্ধুটি বুখোর কাছেই থাকে। আপনারা তার বাড়ীতে সেই রাতটা কাটিয়ে পরদিন মশকে রুশিয়া পৌছে যাবেন।

সুভাষ — বুখো? বুখো কোন জায়গায় ম্যাপে দেখাও তো লালাজী।

[উত্তমচাঁদ দেখাইলেন]

হুঁ কতটাকা চায় ওরা?

উত্তম — সে কিছু নয়, নেতাজী, ও সব ঠিক হয়ে গেছে

সুভাষ — মহাফিরের সবটাকা এখনই দিয়ে দিও না লালাজী। আমরা

রুশিয়ায় পৌঁছে গিয়েই ওর হাত দিয়ে তোমাকে পৌঁছা খবর পাঠাব। তাকে বলে রাখো, সেই চিঠি তোমার হাতে এনে দিয়ে তবে যেন বাকী টাকাটা নেয়। চিঠিতে যদি জিয়াউদ্দিন স্বাক্ষর করি তবে বুঝবে নিরাপদেই পৌঁছেচি। আর যদি রহমত খাঁ লিখি তবে বুঝবে বিপদ ঘটেচে, মহাফির বিশ্বাস-ঘাতকতা করেচে। তখন সর্দ্দারজী ও তুমি যা ভাল বোঝ করো।

উত্তম — তাই হবে নেতাজী।

সুভাষ — রণজিত সিং! আমার চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত তুমি কাবুলেই থাকবে। মস্কোতে ওরা জানুক যে আমি তোমার সঙ্গে রুশিয়ায় যাব বলে কাবুলে অপেক্ষা করচি। সেখানে যে ভাবেই হোক আমি সোভিয়েট নেতাদের আমি ধরবো, তুমি ভেবো না। অন্য উপায় যদি নাই করতে পারি তবে জেলে যাব, জেলের ভিতর দিয়েই ওদের সামনে উপস্থিত হবার পথ করে নেব। তুমি গান্ধীজীর জবাব কিছুতেই তার আগে ওদের জানিও না। দেখি, রাশিয়া কেমন চালবাজ। আমার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মলোটৃভ্ আগে কর্ত্তব্য স্থির করুক, তারপর গান্ধীজীর জবাব ওদের জানানো হবে।

[দৌড়িয়া রণবীরের প্রবেশ]

রণবীর — পু-লি-শ-!! নীচে চারজন কনেষ্টবল দাঁড়িয়ে আছে। ইন্স্পেক্টর দোতালায় আস্চে।

[দৌড়িয়া প্রস্থান]

সুভাষ — [দাঁড়াইয়া উঠিয়া নিম্নস্বরে] আমি জিয়াউদ্দীন, বোবা ও কালা, বুঝলে? সর্দ্দারজীর কাছে ড্রাইভিং শিখ্‌চি।

[পুলিশ ইন্স্পেক্টরের প্রবেশ]

পুলিশ [সেলাম গ্রহণ করিয়া] এই যে লালা উত্তমচাঁদ। তবিয়ত, মেজাজ

শরিফ্ লালা সাহেব? বাঃ বেশ তোফা ঘর সাজিয়েচেন তো! এবার কতটাকা লুটলেন ?

উত্তম — হুজুরের আশীর্ব্বাদে দিন কেটে যাচ্ছে।

পুলিশ — [উত্তমচাঁদকে একপাশে টানিয়া নিয়া] আমার দস্তুরী ?

উত্তম — এই এক হপ্তা আগেই যে দিলুম ?

পুলিশ — এই এক হপ্তা তো আপনার নিরাপদেই কেটেচে লালাজী?

উত্তম — হ্যাঁ. হুজুর, পুলিশ খুব সাহায্য করেচে।

পুলিশ — তবে ? অন্য এক হপ্তাও এমনি সাহায্য পাবার আর্জ্জি মঞ্জুর করিয়ে নিন্।

উত্তম — তখন যে বলেছিলেন ওটা একমাসের পুরো মঞ্জুরী দিলেন!

পুলিশ — তা তো বলেছিলুম। কিন্তু এক হপ্তা কি কম সময় হল ? মফতে কিছু জুটে গেল, হা, হা, হা।

উত্তম — তাই মঞ্জুরী না নিলে এখন এক হপ্তায় আমারই কত কিছু ঘটতে পারে!—হুজুর, দীন দুনিয়ার মালিক আপনি, গরীবকে মেরে ফেলবেন না হুজুর। ঐ বিলায়েত পাঠান এবার দশহাজার রূপেয়া মুনাফা পেয়েচে হুজুর। ওকে চাপ দিলে ঢের বেশী মিলবে হুজুব। গরীব কে রেহাই দিন।

পুলিশ — বিলায়েত তো হাতেই আছে, যাবে কোথায় ?—দশ-হাজার মেরে দিয়েচে ? হুঁ!—

তা আমি এলাম, একটু খাতির ও করবেন না ? বিশ, ত্রিশ যা হয়।

উত্তম — কিছু কম নিন হুজুর। আমি আপনার কেনা গোলাম।

পুলিশ — না, না, বেশী বকিও না উত্তমচাঁদ। এরকমে আমার মান থাকে না।

উত্তম — [হাত কচলাইয়া] হুজুর—

পুলিশ — আবার তবে সুরু করব?—

[রণজিত সিংকে দেখাইয়া] ঐ লোকটা কে ?

উত্তম - হুজুব—

পুলিশ — [রণজিত কে] এই ! এদিকে এস। তুমি কে ?

রণজিত—হুজুর, গোলাম লরী ড্রাইভার।

পুলিশ — লাইসেন্স আছে ?

বণজিত—হ্যাঁ, হুজুব।

পুলিশ - দেখাও।

[বণজিত লাইসেন্স্ হাতে দিলেন, তাহা লইয়া]

হুঁ ! তোমাকে সনাক্ত কববাব কেউ আছে ?

রণজিত—হুজুর, লরী ড্রাইভাবের আড্ডাতে খবব দিলে ওরাই সনাক্ত করবে !

উত্তম — এঁরা সব আমার জানা লোক হুজুর। দোহাই হুজুব, যা ফবমাস করেচেন তাই দেব হুজুর ; প্রসন্ন হোন্।

পুলিশ — [হাসিয়া] আচ্ছা, আচ্ছা, নিয়ে এস।

[সুভাষকে উদ্দেশ্য কবিয়া পুস্তু ভাষায় কি বলিতে লাগিলেন ও সুভাষের নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন।]

উত্তম — [ব্যস্তসমস্ত হইয়া] ও লোকটা কালা, বোবা, হুজুব। ওর, নাম জিয়াউদ্দীন, ড্রাইভার সাহেবেব কাছে ড্রাইভিং শিখচে।

পুলিশ — ও কি আফশোষ ! এমন সুরত চেহাবা। তা কানে শোনে না, ড্রাইভিং শিখে ওর কি উপকার হবে ? কেউ তো আর ওকে চাকরী দেবে না। কথা বোঝানো মহা হয়রানী। আর কালার জিম্মায় একসিডেণ্ট্ করে করে দফাটি রফা করে দেবার জন্যে কে আর গাড়ী ছেড়ে দেবে হে ?

রণজিত—এই হুজুর, বুঝলেন না হুজুর, লোকটা খুব জোয়ান, আর খুব

খাটতে পারে। তাই তাকে দিয়ে গাড়ী সাফ করাই, ঢাকা খোলাই, হাতল ঘোরাই, এই সব আর কি!

পুলিশ— হা, হা, হা, ভাল, ভাল,—
নিয়ে এসো না লালাজী, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

উত্তম — এই যে যাই হুজুর।

[প্রস্থান]

ভকতরাম—হুজুরের কব্জি ঘড়িটা তো ভারী সুন্দর। একটু দেখতে পাই কি হুজুর? কত দিয়ে কিনলেন?

পুলিশ— ওর নাম কি—এই ধবোগে—তিন চারশো রূপেয়া হবে। সিনর কারোণীর হাতে যে ঘড়িটা আছে তার চেয়েও এটা সরেস। বিলিতি দোকানে এক মেম সাহেব নিজে পছন্দ করে ঘড়িটা আমাকে কিনতে বলেছিল।—

[ঘড়ি খুলিয়া ভগতরামের হাতে দিলেন]

ভগত -- জবরদস্ত ঘড়ি, হুজুর। কেমন ঝিলিক দিচ্ছে দেখুন।

[চোখ দিয়া রণজিতকে ইঙ্গিত করিলেন]

রণজিত—[ঘড়িটা তুলিয়া লইতে লইতে] দেখি, দেখি, বাঃ, কেমন সুরেলা টিক্‌টিক করচে। ওটার ভিতর নিশ্চয়ই একটা মেমসাহেব বসে বিলিতি বাজনা বাজাচ্ছে। একটু খুলে দেখব হুজুর?
[সুভাষ উদ্বিগ্ন হইয়া বণজিতকে চিমটি কাটিলেন। রণজিত হাত সাফাই দেখাইবার লোভ কষ্টে সম্বরণ করিলেন]

পুলিশ হা, হা, হা, খুলে দেখবে ওটা? আচ্ছা, আর একদিন দেখো। নাও ওটা দিয়ে দাও।

রণজিত—ওটা দিয়ে দেব? মেমসাহেবকে না দেখেই হুজুর? চলুন না

পুলিশসাহেব, কোন বিলিতি দোকান থেকে কত টাকা দিয়ে ওটা কিনলেন, দেখাবেন চলুন।

[ঘড়ি লইয়া গমনোদ্যত]

পুলিশ— [লাফাইয়া উঠিয়া] এ্যাও, বেল্লিক, খবরদার—

[সুভাষ সজোরে রণজিতের পায়ে নিজের পায়ের গোড়ালি দিয়া আঘাত করিলেন]

রণজিত—[দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া] আর বিলিতি দোকানে গিয়েই বা কি হবে হুজুর। অত টাকা পাব কোথায় যে কিনব? আহা একখানা ঘড়ি বটে, লোভ সামলান যায় না হুজুর।

[যেন ঘড়িটা প্রান ধরিয়া অন্যের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছে না যেমন করিয়া চোখ বুঁজিয়া, মুখ ফিরাইয়া ঘড়িটা দিল]

পুলিশ —বেতমিজ্, কমবকৃত, আর একটু হলেই তোকে জুতোপেটা করতুম। তোর ডানহাতটা মুচড়ে ভেঙ্গে দিতুম। শালা হারামজাদ !

এ্যাও উত্তমচাঁদ !

[ব্যস্ত হইয়া উত্তমচাঁদের প্রবেশ ও একটা তোড়া ইনস্পেক্টরকে দান ও ক্রোধ দমন করিতে করিতে ছোঁ মারিয়া সেটা ছিনাইয়া লইয়া ইন্‌স্পেক্টরের সবেগে প্রস্থান।]

সুভাষ— করছিলে কি সর্দ্দারজী? সর্ব্বনাশ হচ্ছিল আরকি? ঘড়িটা তুমি নিয়ে নিতে ঠিক, পালাতেও ঠিক। কিন্তু তেমি ঠিক তোমার কাবুল যাসটাও চিরদিনের মত ঘুচে যেত। আমাকেও ধরিয়ে দিতে। ঘড়ি হাতছাড়া হয়ে গেলে ব্যাটা ক্ষ্যাপার মত আমাদের নিয়ে পড়ত। তখন থানায়, কেতোয়ালীতে, টানা হ্যাচড়া করে একটা কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দিত। পরিচয়টা আর

লুকোনো যেত না। তুমি গা ঢাকা দিতে পারতে কিন্তু আমাদের কি দশা হত বল তো ?

রণজিত—লাল্লাজী ! ও ব্যাটার হাতে রাজার ঘড়িটা দেখে আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। শালা ! আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি ওটার ঘাড় মটকাতাম। ওঃ শালা ! !—

উত্তম —শান্ত হও সর্দ্দারজী ! ঘড়ি গেচে বলে দুঃখ করো না। রুশিয়া পৌঁছে গেলে নেতাজীর অমন ঢের সোনার ঘড়ি হবে।—যাক্, বাঁচা গেল। ব্যাটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গুটি গুটি পালিয়ে গেল। ও রকম অভিজ্ঞতা ওর জীবনে বোধ হয় এই প্রথম।

সুভাষ —রাগের সামাল দিও সর্দ্দারজী। মনে আছে তো এখনও কিছুদিন তোমায় কাবুলে থাকতে হবে ?

রণজিত—না, রাজা, এবার মাথা ঠাণ্ডা হয়েচে। কাবুলে থাকা আর আমার নিরাপদ হবে না। আমিও কালই কাবুল ছাড়ব। ভাগ্যিস লাইসেন্সটা ওর হাতে ফেলে রাখিনি।

সুভাষ —কিন্তু উত্তমচাঁদ যে রইল !

রণজিত—সে জন্য ভাবতে হবে না রাজা ! সে তো কিছুই করেনি, এমনকি উপস্থিতও ছিল না। তা ছাড়া ওর অনেক অলিগলির সন্ধান জানা আছে।

ভগতরাম– কি মজা ! গোয়েন্দাটা যেমন তিড়িং মিড়িং করে নেতাজীর ঘড়িটা হাতিয়েছিল, তেমি আক্কেলটা পেয়েছে। পুলিশ ইনস্পেক্টরটি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘড়িটা আত্মসাৎ করেচে। চামচিকের কপালে সইবে কেন ? বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে, চোরের উপর বাটপাড়ী !

উত্তম — এবারের মত ফাঁড়া কেটে গেল। আর উপদ্রব করবে না। হ্যাংলা বানর তার মনের মত পাকা রম্ভাই পেয়েচে, এখন কিছুদিন

ঠাণ্ডা থাকবে। নেতাজীও রম্ভা দেখিয়ে ততদিনে পগার পার হবেন।

[একটা সিলকরা মোহরাঙ্কিত চিঠি লইয়া রণবীরের প্রবেশ ও উত্তমচাঁদকে প্রদান]

উত্তম — [খুলিয়া চিঠি পড়িতে পড়িতে সোল্লাসে] দেখুন, দেখুন, নেতাজী ! সিনর কারোণী লিখেচেন। আজ না জানি কার মুখ দেখে উঠেছিলুম !

সুভাষ —[চিঠি পড়িয়া] সাবাস কারোণী ! এতো অনেক ভাল হল উত্তমচাঁদ। হঠাৎ কপাল খুলে গেল দেখ্‌চি। শোনো, শোন কারোণী এতদিনে পাশপোর্ট যোগাড় করেছে। রুশিয়াকে ধাপ্পা দিয়ে কি করে আমাকে নেবে তার মতলব ওরা এই করেচে যে ইটালী থেকে সিনর মাৎসোত্তা বলে একটি ভদ্রলোককে ওরা কাবুলে পাঠাচ্ছে। আজই তার পৌছোবার কথা। তিনি এলে আমি সিনর মাৎসোত্তা সেজে তাঁর পাশপোর্ট নিয়ে ইটালী পাড়ি দেব এই ব্যবস্থা হয়েচে। ওদের প্ল্যান মত কাজ হলে কালই আমাকে নিয়ে প্লেন ছাড়বে।

ভগত — জয় ভগবান ! খুসীতে একটা ভীষণ কিছু করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

রণজিত—আনন্দ করো ভাই আনন্দ করো, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। এস আলিঙ্গন দাও—

[উল্লাসে সকলকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন]

উত্তম — অমরনাথ, বাড়ীর ভিতর খবর দাও। আজ সবাই মিষ্টিমুখ করবে।

উত্তমচাঁদের স্ত্রী—[প্রবেশ করিতে করিতে] খবর দিতে হবে না অমরনাথ। আমি সব শুনেচি।

[উত্তমচাঁদের কন্যা ছুটিয়া সুভাষের কাছে আসিল ও সুভাষকে জড়াইয়া ধরিল]

উঃ কন্যা—নেতাজী, আমি রাখী পরাতে এসেচি। অনুমতি করুন [রাখী বাঁধিয়া দিলেন] ভগবান সব বিপদে আপনাকে রক্ষা করুন। যাবার বেলা হল, আজ ভারতের নারীর এই একান্ত কামনা আপনার যাত্রা জয়যুক্ত হোক।

[প্রস্থান]

রণজিত—কি সুন্দর!—আপনি ঠিক বলেছিলেন নেতাজী, দেশ জেগেচে। আর ভয় নেই। দীপশিখা হাতে নিয়ে ভারতের নারী অন্তঃপুর ছেড়ে বেরিয়ে এসেচে। এতদিন কি যেন একটা অভাব ছিল, আজ তা মোচন হল। ভারতশত্রু! যদি চোখ থাকে তবে দেখে নাও, পথ থেকে সরে দাঁড়াও।

সুভাষ — উত্তমচাঁদ, বন্ধু, কাবুল ছেড়ে চললুম। ভারতের সীমান্তে শীঘ্রই মুক্তি ফৌজের ভেরী নিনাদ শুনতে পাবে। সেদিনের প্রতীক্ষায় সব বিপদ তুচ্ছ করে দেশকে প্রস্তুত কর। সর্দারজী, ভগতরাম আমাকে বিদায় দাও। তোমাদের ছেড়ে অকূলে ঝাঁপ দিতে চললুম। যেখানে থাকি, যে ভাবে থাকি, দেশসেবায় একাত্মবোধ স্বর্ণডোরে আমাদের মন এক করে বেঁধে রাখবে। বিপ্লবের বাণী স্তিমিত হতে দিও না। আমি আবার আসবো। মায়াবীর বাঁশীতে ভুলে ততদিনে দেশ যেন ঘুমিয়ে না পড়ে।

উত্তম — দিনগুলো কি করে স্বপ্নের মত কেটে গেল। এই তো সেদিন অমরনাথ চুপি চুপি বললে নেতাজী কাবুলে এসেচেন, সরাইতে আত্মগোপন করে আছেন। নেতাজীকে নিজের ঘরে পাবার সহজ লোভটা দমন করলুম। তাঁর কাজের অন্তরায় হব না। তবু ভাবনা ছিল এই বিদেশে না জানি কত অনভ্যস্ত ক্লেশই তাঁকে পেতে হচ্ছে! শেষে একদিন তিনি এলেন। তখন বুঝিনি ভারতের কি বিচিত্র কাহিনী ধীরে ধীরে আমারই চোখের সামনে রচনা হয়ে যাচ্ছে। আমার স্ত্রী জানত না কাকে ঘরে নিয়ে এলুম। সন্দিগ্ধ হয়ে আমার হিত কামনায় সে বাধা দিতে

অগ্রসর হল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নামের কি মহিমা! নামটা বলতেই বিমল আনন্দে তার চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল। ছল ছল চোখে সে আমাকে অনুযোগ করলে, "এতদিন বলো নি কেন? এযে আমাদের পরম সৌভাগ্য! দেশসেবার এমন সুযোগ জীবনে আর আসবে কি?" সেদিন থেকে অতিথি পূজার সব ভার সে স্বহস্তে তুলে নিল কত কৌশলে নেতাজীকে প্রতিবেশীদের চোখের আড়াল করে রাখ্‌ল। চল্লিশদিন একসঙ্গে ছিলুম। নেতাজীকে একেবারে আপনার করে পেলুম। জানলুম তিনি শুধু বীর নন, তিনি মহৎ। তাঁর কাছে এলে বৃহত্তর সমৃদ্ধ আলোকে আমাদের ছোট ছোট সুখ দুঃখ কত তুচ্ছই না মনে হয়। তাঁর করুণ বাক্যে, অন্তরের স্পর্শে, মন সব ভুলে উর্দ্ধমুখী হয়ে যায়। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কতদিন ভেবেচি ভারতের বাহু পুণ্যফলে বিধাতার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি নেতাজীকে সে পেয়েচে, বজ্র হতেও যে কঠোর, আবার কুসুমের চেয়েও কোমল। এক ফোঁটা চোখের জল যে সইতে পাবে না, আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতেও এতটুকু দ্বিধা করে না। এই নেতাজীকে ভারত যেদিন চিনবে, আসমুদ্র হিমাচল সেদিন মিলিত কণ্ঠে, বজ্রমন্দ্ররবে, আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে বলবে নেতাজী কি জয়। সেই অশনি নির্ঘোষে প্রবল প্রতাপ বৃটিশ সম্রাটের রত্ন সিংহাসন টলমল করে উঠবে। সেই সুদিন আগত হিন্দুস্থান, বলো নেতাজী কি জয়!!

[নেতাজী কি জয় বলিয়া সকলে নত হইয়া সুভাষকে অভিবাদন করিলেন]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

[বার্লিন। উইল্ হেলম্ ষ্ট্রাসে সুভাষচন্দ্র ও ডাঃ গেবেল্‌স্]

গেবেল্‌স্—হাইল্ হিট্‌লার !

সুভাষ—নমস্কার হের্ গেবেল্‌স্।

গেবেল্‌স্—বসুন সিনর মাৎসোত্তা

[দুইজনে উপবেশন করিলেন]

সুভাষ - ধন্যবাদ।

গেবেল্‌স্—শত্রুর চোখে ধূলো দিয়ে খুব পালিয়ে এসেচেন। হা, হা, হা।

সুভাষ — হাঁা খুব বেঁচে গেছি। সবই তো জানেন। রুশিয়ায় যাব বলে ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে ছিলুম। কাবুল থেকে রওনা হব এমন সময় সিনর কাবোনী ইটালীর পাশপোর্ট এনে দিলেন। ভাবলুম অযথা জীবন বিপন্ন করে লাভ কি, ইটালী হয়েই মস্কো যাওয়া যাবে। সেটাই আপাততঃ সহজ পথ হবে, তা—

গেবেল্‌স্—হাঁা, হের্ বোসে' তারপর থেকেই ফুয়েরেরের দৃষ্টি আপনাকে অনুসরণ করছিল। আমরা ইটালীকে জানিয়ে দিয়েছিলুম যে আমরা কিছুদিনের জন্য সাময়িক প্রয়োজনে আপনাকে বার্লিনে পেতে চাই, যদি ওদের বা আপনার কোনো আপত্তি না থাকে। ফুয়েরের বলেছিলেন যে আমাদের শত্রুর সঙ্গে যার শত্রুতা সে আমাদের পরম মিত্র।

সুভাষ — আপত্তির কিছুমাত্র কারণ ছিলো না হের গেবেল্‌স্। বার্লিন হয়ে রুশিয়া যাব আমিই স্থির করেছিলুম, কিন্তু এখন দেখ্‌চি রুশিয়া আমাকে চায় না। আমিও আর রুশিয়াকে চাই নে।

গেবেল্‌স্—কেন ?

সুভাষ — যে আশায় বুক বেঁধে রুশিয়ায় ছুটে যাচ্ছিলুম, সে আশা আমার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। রুশিয়া পিছিয়ে গেল। গান্ধীজীর পূর্ণ সহায়তা না পেলে ওরা এখন কোনো সাহায্যই করবে না। সুভাষ বিপ্লবী ভারতের অদ্বিতীয় নেতা বটে, দুবার ভারত কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিল বটে, কিন্তু তার দম্ভ টেঁকে নি, সে বাধ্য হয়েছিল সরে দাঁড়াতে। গান্ধীর পুরোপুরি আনুকূল্য চাই, সহযোগ চাই, নইলে কাজ হবে না, ওরা ভারতের দিকে এখন পা বাড়াবে না, এই রুশিয়ার কথা। লেনিনের আদর্শ, জগতজোড়া সোভিয়েট বিপ্লবের কল্পনা, কিছুই সমগ্র ভারতের সম্মিলিত বিপ্লবীদলকে মর্য্যাদা দিতে সক্ষম হল না। এমন কি, তার প্রতি পরাঙ্মুখই হল।—

গেবেল্‌স্—জগত্‌জোড়া বিপ্লব! হ্যাঁ! ওসব বুলিতে আপনিও ভুলেছিলেন? সব কথার কথা হের বোসে। কখনও কেউ তা দেখেছে, না কখনও তা হয়েছে? ছোট, বড়, মাঝারি, নানা স্তরের মানুষ রয়েচে। যারা চোখে দেখে না, কানে শোনে না, সেই সব অন্ধদের চির দিন অন্যেই চালাবে। বড়োরাই চিরদিন তাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। জগতের কোথাও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি, কখনও ঘটবে না। দেশের অন্ধ আচ্ছন্ন শ্রমিকদের দেশের বড়োরাই চালাবে, সেটাই স্বাভাবিক। বিদেশ থেকে একদল মুরুব্বি এসে তাদের চালানোর ভার নেবে সেটা দেশের বড়োরা তো সহ্য করবেই না যারা কিছুটা সজাগ হয়েছে,

দেশের সেই সব মাঝারিরাও তা হজম করতে পারবে না। দেশের বড়ো ও মাঝারির স্বাভাবিক নেতৃত্বে হস্তক্ষেপ করতে গেলে বোঝাপড়াটা প্রথমে ওদের সঙ্গেই হতে হবে। ওদের শক্রতা বেঁকে থাকলে, অন্ধকে যত আলোই দিতে চান, উল্টোপিঠের অন্ধকারটুকু তার চেয়ে বেশী বেরিয়ে আস্‌বে। মনে করবেন না, হের বোসে, রুশিয়া ও সব কথা জানে না। সব জানে। কিন্তু নিজেকে সে এত বড়ো ভাবে যে জগতের সব ছোটদের চালাবার তার একচেটে অধিকার হয়েচে এই অসম্ভব কল্পনা সে পোষন করে। জানেন, হের্‌ বোসে, ভারতে রুশিয়ার প্রাধান্য বিস্তারের জন্যই সে আপনাদের সহায়তা চায়? দূরদর্শী গান্ধীকে এমন অর্ব্বাচীনের কাছে রাজী করানো যাবে না বলেই আপনাকে শূন্য হাতে ফিরে আস্‌তে হয়েচে?

সুভাষ — ভারতে রুশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা! বলেন কি, হের্‌ গেবেল্‌স্‌, সাম্যবাদী রুশিয়ার সর্ব্ব মানবের সাম্যই যে আদর্শ।

গেবেল্‌স্‌—সাম্যবাদ!—দেশে দেশে সাম্যই আগে আনুক রুশিয়া। জাতিতে জাতিতে সাম্যই সে আনুক আগে। সর্ব্ব মানবের সাম্য!!—বড বড় বুলী সব হের বোসে। সমান সুযোগ, সমান সুবিধে, সব সমান পেয়েও এক পিতার পাঁচ সন্তান, পাঁচ রকম হয়ে যাচ্ছে, আর এ কি না সকল মানুষের সাম্য! হ্যাঁ!—আমরা বড় বড় কথা বলিনে, গালভরা বুলী উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিনে। কিন্তু আমাদের নিউ অর্ডার চক্‌চকে মানুষের মত ছেলে ভুলানো আকাশ কল্পনা নয়, ওটা একটা বাস্তব পরিকল্পনা। জগতের সত্যিকার অবস্থা মেনে নিয়ে সমগ্র জগতটাকে আরো এগিয়ে দেবার বিরাট কল্পনা। জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য জাগতিক নিয়ম অবলম্বন করেই আনিতে হয়। মাটিতে পড়ে গেলে মাটি

ধরেই উঠ্‌তে হয়।—জাগতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে অগ্রসর হবার দুরাশা যে করে সে হয় মূর্খ, নয় সে স্বার্থ সাধনের উপায় বলে ও পথ নিয়েচে।

সুভাষ —[হাসিয়া] এত কথার পর বোধ করি রুশিয়ার সঙ্গে আপনাদের সন্ধি আর বেশীদিন টিকবে না ?

গেবেল্‌স—সন্ধি ? ও তো একটা কাগজের টুকরো ! যে কাগজে তা লিখা হয়েচে, সেই কাগজের মূল্যটুকু পর্য্যন্ত তার নেই।—বৃটেন ভুল করে আমাদের শত্রুতা করচে, বুঝতে পারচে না যে রুশিয়াই তার আসল শত্রু আমরা তার পরম মিত্র। বৃটেন অযথা আমাদের পেছনে লেগেচে বলেই না রুশিযার সঙ্গে সাময়িক প্রয়োজনে সন্ধি করতে হয়েচে ! ষ্ট্রাফোর্ড ক্রীপস্‌ রুশিয়ার কাণমন্ত্র শুনে শুনে গদ গদ হচ্ছে আর ভাবচে রুশিয়ার মত এমন মিত্র সারা ভূমণ্ডলে নেই ! একটু বুদ্ধিও যদি তার থাকত তবে আজ মস্কোতে পড়ে না থেকে সোজা বার্লিনে এসে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করত। আহাম্মুক কোথাকার !— [একটু থামিয়া] বার্লিনে কেমন আছেন, হের বোসে আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আর কিছু করতে পারি কি ?

সুভাষ —ধন্যবাদ, হের গেবেল্‌স্‌, আপনাদের আশ্রয়ে পরম সুখেই আছি। সব ছাপিয়ে আমার মনে এই কথাটাই জাগচে যে আজ আমি রাহুমুক্ত। আজ আমার কোনো কথা ও কাজ সেই রাহুর কর্ণগোচর হবার ভয় নেই যার কুক্ষি থেকে বিরুদ্ধশক্তি নির্গত হয়ে আমার সব উদ্যম সব প্রচেষ্টা চিরদিন গ্রাস করতে উদ্যত হয়েচে। যে সতর্ক দৃষ্টি, সজাগ কর্ণ, একটা ক্রূর অভিশাপের মত শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, অহর্নিশি আমাকে অনুসরণ করেচে,

আজ এতদিনে আমি তার কবল হতে মুক্ত হয়েছি। বহু অধ্যবসায়ে এই মুক্তি অর্জ্জন করতে হয়েছে হের গেবেল্‌স্।

গেবেল্‌স্—উর্ণনাভের জালে পতঙ্গই ধরা পড়ে; হের বোসে, সিংহশিশু একঝটকায় তাকে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে। আপনার আবার ভাবনা! যে গেষ্টাপো বাহিনী দিয়ে আমরা আপনার দেহ ও মন্ত্রণা রক্ষার ব্যবস্থা করেছি তার ব্যূহ ভেদ করে আপনার জানালা পর্য্যন্ত উঁকি দিতে পারে এমন লোক ভূমণ্ডলে জন্মায় নি!

সুভাষ —[হাসিয়া] জানি হের গেবেল্‌স্, বিশ্ববিদিত জার্ম্মান গেষ্টাপো আমাকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির গোচর করে মর্য্যাদা দিয়েছে। কিন্তু আমার কার্য্যকলাপ জার্ম্মান ফুয়েরেরের স্বার্থ-বিরোধী নয়। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। ভারত যদি স্বাধীন হয়ে যায় তবে আপনারা অন্ততঃ অসুখী হন না। শত্রু যা হারাবে যতটুকুই তার হস্তচ্যুত হবে ততটুকুই যে আপনাদের লাভ সে কথাটা আপনারা ভালই জানেন। জার্ম্মান ফুয়েরেরের নিজের স্বার্থই গেষ্টাপো ব্যূহের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে, গেষ্টাপোকে ভয় করবার মত আমার কিছু নেই।

গেবেল্‌স্—ছি, ছি, ও কি বলছেন হের বোসে, গেষ্টাপো আপনার দেহরক্ষী গেষ্টাপো আপনার হুকুমের দাস।

সুভাষ — আমি জানতুম আমার দাস আমিই নিযুক্ত করি। আমার মতামতের অপেক্ষা না রেখে আপনারা যে "দাস" নিযুক্ত করেছেন তাকে যদি সত্যই আমার ভৃত্য বলে মেনে নিতে কোথাও বাধে তবে দুঃখিত হবেন না হের গেবেল্‌স্।

গেবেল্‌স্—বিলক্ষণ কি যে বলেন! আপনি আমাদের কত আপনার জন—

আপনি ও গেষ্টাপোকে সন্দেহ করেন ?

না, না, আপনি ঠাট্টা করছেন !

সুভাষ — ঠাট্টাটা কোন তরফ থেকে হচ্ছে সে কথা না হয় মুলতুবীই থাক্ না ? বিশেষ ও আলোচনায় যখন আপনার বা আমার কারো কাজেরই তিলমাত্র পরিবর্ত্তন হবে না ?

গেবেল্‌স—থাক্ থাক্ হের্ বোসে, ও নিয়ে কথা কাটাকাটির কোনো মানে হয় না। আপনার কাছে আমরা একটা প্রস্তাব করতে চাই। বেশ ভেবে জবাব দেবেন। নরওয়েতে কুইজ্‌লীংকে আমর রাষ্ট্রপতি করে দিয়েচি। আপনাকেও ভারতের সিংহাসন দেব, আপনি কুইজ্‌লিং এর মত আপনার দেশে পঞ্চম বাহিনী গড়ে তুলুন। ইউরোপের সর্ব্বত্র আমাদের পঞ্চম বাহিনী গড়ে উঠ্‌চে, আপনাকে পেলে ভারতের পঞ্চম বাহিনী সহজেই গড়ে তুলতে পারব। জার্ম্মানীর বিজয় বাহিনী যখন অপ্রতিহত গতিতে ভারতের সীমান্তে এসে সিংহনাদ করবে, তখন আপনার পঞ্চম বাহিনী ভিতর থেকে শত্রুর যুদ্ধোদ্যম বিশৃঙ্খল করে দিয়ে আমাদের সুনিশ্চিত চরম সাফল্যের পথ সুগম করে দেবে ভেবে দেখুন বৃথা রক্তপাত থেকে রক্ষা করে আপনি তাদের কত কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন। মহাযুদ্ধের শত বিভীষিকা থেকে তাদের উদ্ধার করে দেশের কোটি কোটি নরনারীর কত আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করবেন। তারপর যুদ্ধের শেষে প্রবল প্রতাপ ফুয়েরের স্বহস্তে আপনার শিরে ভারতের রাজমুকুট পরিয়ে দেবেন। জার্ম্মানী ও ভারতবর্ষ চিরমিত্রতাপাশে আবদ্ধ হয়ে এক যোগে ভারতের মঙ্গলকামনায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে আত্মনিয়োগ করবে। ভারতবাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আপনার হাত দিয়েই ফিরে আসুক। বলুক, আপনি প্রস্তুত ?

সুভাষ —[তৎক্ষণাৎ] না, হের গেবেল্‌স্‌, ও প্রস্তাবে আমি সম্মত নই। আমি জানি ভারতের রাজমুকুট তারই প্রাপ্য ভারতবাসী নিজে যাকে সেই মুকুট পরিয়ে দেবে। জার্ম্মান সৈন্য বাহিনী দিয়ে যে মুকুট অর্জ্জিত হবে, জার্ম্মান সৈনিক দিয়ে সে মুকুট রক্ষাও করতে হবে। অন্য আশ্রয় তার নেই, অন্য অবলম্বনহীন ও মুকুট জার্ম্মান সৈন্যের করধৃত হয়েই ছায়ানৃপতির শিরশোভা বর্দ্ধন করবে। জার্ম্মান সৈন্যের মন যুগিয়ে চলতে পারলে, রাজদণ্ড তাদের হাতে ছেড়ে দিলে তবেই ও রাজমুকুট অব্যাহত থাকবে।—জার্ম্মান ফুয়েরের কি এই ভাবেন যে সে মুকুট গ্রহণে আমার সম্মতি আছে ?

গেবেল্‌স—জার্ম্মান সৈন্যের হাতে রাজদণ্ড তুলে দিতে হবে এমন কথা তো আমরা বলিনে ও সব আপনার কল্পনা। কুইজলিংও তো কই এমন কথা বল্‌চে না ?

সুভাষ — কুইজলিং এব ঋণ জমে উঠ্‌চে, হের্‌ গেবেল্‌স্‌। মূর্খ জানেনা যে একদিন তাকে এই ঋণেব সবটুকুই পরিশোধ করতে হবে।

গেবেল্‌স্‌ আপনি যে দেখচি শত্রুর অলীক প্রচার বিশ্বাস করে আমাদের সব কিছুই ভুল বুঝতে সুরু কবেচেন। আপনি যা বলচেন সে তো আমাদের শত্রুরাই ঈর্ষা পরবশ হয়ে প্রচার কবে বেড়াচ্ছে। আমাদের যারা মিত্র তারা তো কখনও এমন কথা বলে না। আপনার কাছে আমরা মিত্রের আচরণই প্রত্যাশা করি, হের বোসে !

সুভাষ — মিত্রতা হয় সমানে সমানে। পরাধীন ভারতবাসীর সঙ্গে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি দিগ্বিজয়ী জার্ম্মানীর মিত্রতা তো স্বাভাবিক নয়! অন্য প্রকার সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছাই যে তার চেয়ে বেশী সম্ভব বলে অনুমান হয়!

গেবেল্‌স্‌—সুভাষচন্দ্র বোসে! সাবধান! সাবধান! ফুয়েরের তোমাকে মিত্র বলে বিশ্বাস করেন। আমি এতক্ষণ সেজন্যই উপযুক্ত শিষ্টাচাব করেচি। কিন্তু সব কিছুরই সীমা আছে! আমাদের ধৈর্য্যও অসীম নয়!—ইংবেজের পদলেহী ভারতীয় দাসেব প্রতি কি ব্যবহার সমীচীন আমাদের তা অজানা নয়। মনে বেখো, তুমি আমাদের হাতের মুঠায় আছ। যদি ইচ্ছা করি, এই মুহূর্ত্তে তোমাকে কীটের মত পদদলিত করতে পারি।—সাবধান!

সুভাষ — সেই রক্তচক্ষু! গেবেল্‌স্‌, আমাকে চোখ রাঙ্গিও না। সুভাষকে তুমি চেন না। ভেবেচ কি প্রাণের মায়ায় সুভাষ তাব দেশ-মাতাকে তোমাদের কাছে বিক্রয় করবে? ভেবেচ কি পাশব উৎপীড়নে, নরকযন্ত্রণায়, তিলে তিলে পুড়িয়েও তাকে মাতৃঘাতী, নর পিচাশ করে তুলতে পাববে? দেখ্‌তে কি পাও না আমি প্রাণেব মায়া বিসর্জ্জন দিয়েই তোমাদের বিবরে এসে ঢুকেচি? জার্ম্মান গেষ্টাপোর ভয়! তুমি ক্রোধে অন্ধ হয়েচ তাই দেখতে পাচ্ছ না ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে জার্ম্মানীব স্বার্থের মূলেই কুঠারাঘাত করচ।

গেবেলস্‌—দুর্ব্বিনীত কৃষ্ণকায় ভিক্ষুক! তুমি জার্ম্মানীর স্বার্থ আমাকে দেখাবার স্পর্দ্ধা করচ? এখনও বল আমার প্রস্তাবে সম্মত আছ কি না। নইলে, জার্ম্মানীর স্বার্থের যারা প্রতিকূল তাদের প্রতি আমরা কি ব্যবহার করি অচিরেই তা দেখতে পাবে।

সুভাষ — কৃষ্ণকায় ভিক্ষুকই তোমাকে জার্ম্মানীর স্বার্থ দেখিয়ে দেবার স্পর্দ্ধা রাখে গেবেল্‌স্‌। যে কারণে আজ ইটালী ও জাপান স্পর্দ্ধা করচে, ঠিক সেই কারণেই ভারতবাসীও অদূর ভবিষ্যতে তোমার

স্বার্থ সম্বন্ধে তোমাকে সচেতন করবার স্পর্দ্ধা রাখে। জার্মানীর নিজ বাহুবলই যদি তার স্বকার্য্য সাধনে পর্য্যাপ্ত হত তবে ইটালী, জাপান, আইয়ারের সাহায্য লাভের জন্য উমেদারি সে করত না। জগতে সত্য, মিথ্যা প্রচার কার্য্য নানা কৌশলে চালিয়ে দেবার এত চেষ্টাও করত না। স্বার্থের খাতিরেই তাকে অন্যের অপেক্ষা কিছু কিছু রাখতে হয়েচে স্বার্থের খাতিরেই তাকে ভারতবাসীর অপেক্ষাও রাখতে হবে। ভারতবর্ষ যদি তোমার শত্রুর মুঠোয় থাকে, ভারতের ষোল আনা যদি সে তার কাজে লাগাতে পারে তবে তোমার সাধ্য কি তাকে পরাজিত করতে পার? আরো বলতে হবে কি গেবেল্‌স্? রুশিয়ার কার্য্য কলাপ একটু তলিয়ে দেখ, বুঝতে পারবে যে তার বড়ের চাল ভারত-বর্ষকে অবজ্ঞা করচে না। সেও সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে। তার সুযোগ আজও আসে নি, কিন্তু তোমাদের সুযোগ এসেচে। আজ যদি হেলায় তা উপেক্ষা করে যাও তবে সে সুযোগ শীঘ্র ফিরে পাবে না।

গেবেল্‌স্—সেজন্য তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি এই তৃতীয়-বার,—এই শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি, আমার প্রস্তাবে সম্মত আছে?

সুভাষ — আমি ও শেষ জবাব দিচ্ছি, না, কিছুতেই না, তোমার প্রস্তাবে আমার মত নেই, হয় নি, হবে না!!

[দুইজনে রুখিয়া উঠিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বার্লিন। চেন্সেলারী।

হিটলার ও গেবেল্‌স্]

গেবেল্‌স্—ওটা একটা জঙ্গ্‌লী, ওটা একটা আস্ত ভূত। ওটাকে হিম-লারের হাতে ছেড়ে দিন ফুয়েরের।

হিট্‌লার—হুঁ!

গেবেল্‌স্—ভাল ব্যবহারের কোন মূল্যই ওর কাছে নেই। ওটাকে আব আস্কারা দেবেন না। গুঁতোর চোটে সায়েস্তা হলে পথে আসবে।

হিট্‌লার—কি চায় লোকটা?

গেবেল্‌স্—ভাগ্যান্বেষী আর কি! ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে এসেচে বার্লিনে, কোনো সুবিধে টুবিধে হয় কি না। দু'মাস হযে গেল এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে, আর বার্লিনে পড়ে আছে। কিছু করবাব নাম নেই। ভারতীয়দের সঙ্গে মাথামুণ্ডু কি করচে দিন রাত। একটা ক্লাব করেচে। তাতে ফূর্ত্তি করে গল্প গুজব কবে সময় কাটাচ্ছে। কি করে দেশের সবগুলো লোককে ক্লাবেব মেম্বাব কববে সব সময় সেই জল্পনাই কবচে। মুখে বলচে ভারত স্বাধীন করবে। আমরা বললুম, আমাদের পররাষ্ট্র বিভাগে আমরা না হয় ভারত দপ্তর একটা খুলে দেব, তুমি এসে তাতে কাজ কর। না, তাতে সে রাজী নয়। বল্‌লুম পঞ্চমবাহিনী কর। তাতেও সে রাজী নয়। ওটা কাজের লোকই নয় মোটে। আমাদের কোনো কাজেই আসবে না।

হিট্‌লার—ওর মতলব টা কি? কিছুই যদি করবে না তবে আমাদের কাছে এসেচে কেন? যা করচে তা তো দেশে বসেই করতে

পারত।—আচ্ছা, আমি দেখছি। তুমি যাও, ওকে পাঠিয়ে দাও।

[গেবেল্স্ এর প্রস্থান ও ইভা ব্রাউনের প্রবেশ]

ইভা — ফুয়েরের, আজ নাকি সুভাষচন্দ্র বোসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসচে? আমি ওকে দেখব। তুমি বারণ করো না ডিয়ার। লক্ষ্মীটি, আমার এত দেখতে ইচ্ছে করচে।

[সুভাষের প্রবেশ]

সুভাষ—[নমস্কার করিয়া] ভারতবাসীর অভিবাদন গ্রহণ করুন জার্মান ফুয়েরের।

হিটলার—[যথারীতি হাত তুলিয়া] হাইল্ হিটলার। [নিজে বসিয়া] বসুন হের বোসে।

সুভাষ—ধন্যবাদ, হের হিটলার। [বসিলেন]

ইভা — এদের অভিবাদন করার রীতি কি সুন্দর না এডল্ফ্? কেমন নম্র আর গ্রেসফুল!

হিটলার—হ্যাঁ, ডিয়ার। [পরিচয় করাইয়া দিলেন] ফ্রলাইন্ ইভা ব্রাউন, হের সুভাষচন্দ্র বোসে।

[উভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া শিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন]

ইভা — আপনাকে দেখে এরিয়ান্ বলেই ভুল হয়, সত্যি না এডল্ফ্? তুমি তো বলেছিলে ভারতবর্ষের লোক এরিয়ান নয়। ওঁর এমন এরিয়ান্ চেহারা কি করে হল এডল্ফ্?

হিটলার—এরিয়ান্ একটা চেহারা নয় ইভা, এরিয়ান একটা সংস্কৃতি, একটি ঐতিহ্য। যুগে যুগে যারা কুলটুর প্রতিষ্ঠা করেচে, সমগ্র ভূমণ্ডলে যারা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বাহুবলে অপ্রতিদ্বন্দী, সেই হেরেন্‌ফোকই এরিয়ান। নীচ, শঠ, সেমিটিক জাতি চিরদিন কুলটুর প্রচারে বাধা দিয়ে এসেচে। সেই সুদখোর, ধূর্ত ইহুদী—

ইভা — তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠচ এডল্ফ্! ডাক্তার না বারণ করেচে

তোমাকে ? তোমার রক্তের চাপ বেড়ে যাবে এডল্‌ফ্‌ !

হিটলার—না ডিয়ার, আমি উত্তেজিত হব না।

ইভা — বাড়ীটা আপনার পছন্দ হয়েচে তো হের বোসে ? মিলিটারীদের সব ভাল বাড়ী ছেড়ে দিতে হয়েচে বলে এখন ভাল বাড়ীর বড্ড অভাব। তা আশাকরি আপনার খুব অসুবিধে হচ্চে না।

সুভাষ — বহু ধন্যবাদ, মিস্‌ ব্রাউন। আপনারা দুর্দ্দিনে আমাকে আশ্রয় দিয়েচেন, পবপদানত ভারতবাসীর এর চেয়ে বড় আতিথ্য আর কি হতে পাবে ?

হিটলার—বেশ, বেশ, আপনাব বিনয়ে সুখী হলুম। জগতের সব জাতিব অভাব মোচনই আমাব একমাত্র লক্ষ্য। আমার নিউ অর্ডার একটা নূতন পরিকল্পনা সমস্ত জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ওটা করেচি। জগত আমি নূতন ছাঁচে ঢেলে গড়ব, নূতন আলোক আনব পৃথিবীতে--

সুভাষ —হ্যাঁ, হের ফুয়েরেব, তাইত এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন—

হিটলার—বাধা দেবেন না ! !—নূতন করে গড়ে তুলব এই পৃথিবী। আমার নব পরিকল্পনায় কুলটুবের প্রতিষ্ঠা হবে। হেরেন্‌ফোক্‌ এর জয় পতাকা জগতে উড্ডীন হবে। যে অন্ধ এই বিরাট পরিকল্পনার উপকারিতা বুঝবে না, তাকে সঙ্গীনের গুঁতোয় তার নিজের স্বার্থ বুঝিয়ে দিতে হবে। জগতের অন্ধদের প্রতি ও আমার দৃষ্টি আছে, আমি দেখেচি তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। তাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্য করতে আমি নিশ্চয়ই পরাঙ্মুখ হব না। বর্ব্বর ইহুদী চিরদিন তাদের অন্ধ রাখতে চায়, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির ঐ তার উপায়। সে দুরাত্মাদের আমি সমূলে উচ্ছেদ করব, আমি—

ইভা — আবার এডল্‌ফ্‌ ?

হিটলার—না ডিয়ার, আমি উত্তেজিত হব না।

ইভা — আচ্ছা হের বোসে আপনাদের মেয়েরা সাড়ী পরেন, না? সাড়ী আমার খুব ভাল লাগে। আপনার সঙ্গে সাড়ী আছে?

সুভাষ —না মিস্ ব্রাউন, পুরুষরা তো সাড়ী পরে না। আমার সাড়ী নেই।

ইভা —কেন, আপনাব স্ত্রীব সাড়ী নেই?

সুভাষ —[হাসিয়া] আমি অবিবাহিত মিস্ ব্রাউন।

ইভা —তাই নাকি? আপনাদের যে শিশুকালেই বিয়ে হয় শুনেছিলুম। তা আপনি যখন বিয়ে করেন নি তখন এডল্‌ফের সঙ্গে আপনার জমে যাবে। না এডল্‌ফ্? এডল্‌ফ্ বলে যারা শক্তিমান্ তাবা কখনও বিয়ে করে না। কি অদ্ভুত কথা! আপনি কি বলেন হেব বোসে?

সুভাষ —কথাটা ভেবে দেখি নি মিস্ ব্রাউন। তবে ইংরেজদের প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ যতদিন বে' করে নি ততদিন দেশবিদেশের কত লোক তাকে মাথায় করে রাখত, সে ছিল তখন একটা হিরো। যাই সে বিয়ের ফাঁদে পা দিয়েচে, আর অমনি দেখুন না কেমন সুর সুর কবে তার রাজ্য সাম্রাজ্য সব বেহাত হয়ে গেল। কোথায় হিবো, বেচারা এখন দেশান্তবী হয়ে অজানা, অখ্যাত নগণ্য হয়ে পড়েচে। কিন্তু জার্ম্মান ফুয়েরের হিটলারকে দেখুন বিয়ে কবেন নি বলে কেমন বুক ফুলিয়ে রাজ্য জয় করে সারা পৃথিবীর মাথায় চড়ে বসে আছেন!

হিটলার—হা, হা, হা।

ইভা — আহা, তাই বুঝি!—এত বাজেও বকতে পারেন!—তা আপনার ভারী অসুবিধা হচ্ছে বার্লিনে। আপনাকে দেখাশুনা করবার তো কেউ নেই। আমিই যাব একবার সব গুছিয়ে দিতে। কিন্তু কথা দিন, বার্শটেস্‌গাডেনে আমাদের সঙ্গে কিছুদিন

কাটিয়ে আস্‌বেন, আর আমাকে সাড়ী পরাটা শিখিয়ে দেবেন।
এডল্‌ফ্‌, হের বোসেকে তুমি আসতে বলবে না?

হিটলার হ্যাঁ, ডিয়ার!—হের বোসে, আপনার কখন সময় হবে বলুন।

সুভাষ — যেদিন দয়া করে ডাকবেন সেদিনই আমার সময় হবে হের ফুয়েরর।

হিটলার—আচ্ছা, আমি জানিয়ে দেব।

ইভা — নিশ্চয়ই যাবেন হের বোসে। শিশুকালেই কেন আপনারা বিয়ে করেন সে সব কথা আপনার মুখ থেকে শুন্‌ব।

সুভাষ —বহু ধন্যবাদ, মিস্‌ ব্রাউন। ভারতবর্ষের কাহিনী আমার কাছে শুনতে চান সেতো আমার সৌভাগ্য। সুদূর ভারতবর্ষ থেকে প্রাণখানি হাতে নিয়ে সেজন্যই তো এতদূর ছুটে এসেচি। আপনাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট হবে ভারতের প্রতি, সেই আমার আশা। শিক্ষা নাই, স্বাস্থ্য নাই, অর্থ নাই, নাই অন্নবস্ত্র, অন্ধ কুসংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ভারতের নরনারী অতল পঙ্কে নিমজ্জিত হতে হতে অসহায় হাতদুটি পরিত্রাণের আশায় বাড়িয়ে দিয়েচে। কোথায় সে সবল বাহু, অভিশপ্ত মৃত্যুর করাল গ্রাস হতে যে তাকে উদ্ধার করবে? সেই অন্বেষণে জীবন পণ করে বেরিয়েচি। জানিনে এ যাত্রার কোথায় শেষ!

ইভা — [মন্ত্রমুগ্ধবৎ সুভাষের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন]
কি চমৎকার ওঁর চোখের দৃষ্টি, না এডলফ্‌? এই বুঝি প্রাচ্যের সেই মিষ্টিক দৃষ্টি!

[সুভাষ স্তম্ভিত হইয়া থামিয়া গেলেন]

হিটলার—হ্যাঁ, ডিয়ার। [সুভাষকে] আপনি ঠিক জায়গায় এসে পড়েচেন হের বোসে, আর আপনাকে ঘুরে বেড়াতে হবে না। ভারত-

বর্ষের প্রতি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। সিনর মুসোলিনী ও আমি সম্পূর্ণ একমত যে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। যে ইংবেজ বণিক একটা ঘৃণ্য ইহুদীর মনোবৃত্তি নিয়ে ছলে বলে কৌশলে ভাবতকে পদানত করে গর্ব্বান্ধ সাম্রাজ্য শিখরে কৃত্রিম সিংহনাদ করচে, জার্ম্মান ফুয়েরের সে শৃগালের রক্তচক্ষুতে ভ্রূক্ষেপও কবে না। কোনো ভয় নেই হের বোসে। দুঃস্বপ্নের মত ভাবতের বুকে চেপে থাকৃতে তাকে আমি কিছুতেই দেব না। জার্ম্মান বাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে ডান্‌কার্কের যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন বেত্রাহত কুকুবেব মত তাকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল, ভারতের যুদ্ধক্ষেত্রেও তেমনি হতমান, নতশির ইংরেজ ল্যাজ গুটিয়ে পালাবার পথ পাবে না! ভারতকে আমি ইহুদীর প্রভাব থেকে মুক্ত করব। রমেল্‌কে হুকুম দিয়েছি আফ্রিকার পথে মিশর জয় করে সুয়েজ কেনেল্‌ অধিকার করবে। সিরিয়াতে ডার্লানের ফরাসী অনুচরগণ আমার বিজয় বাহিনীর প্রতীক্ষায় এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের সহায়তায় ইউরোপ ও আফ্রিকার মিলিত বাহিনী শুধুমাত্র তর্জ্জনী হেলনে ইবাক অধিকার করবে। তারপর ইরাক পেরিয়েই ভারতবর্ষ! আলেকজ্যাণ্ডার যে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করতে পারেনি, নেপোলিয়ান যে দিগ্বিজয় কল্পনাও করতে পারেনি, আমি তাই সাধন করব। এই সসাগরা ধরণীতে সর্ব্বপ্রথম আমার বাহুবলই—

ইভা — এডল্‌ফ্‌!—

হিটলার— কেন বাধা দাও?—আমিই হব সসাগরা ধরণীর সর্ব্বপ্রথম দিগ্বিজয়ী বীর। আমিই হব পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বভৌম অধীশ্বর। ঘৃণ্য ইহুদীর কবল থেকে সর্ব্বদেশ মুক্ত করব। দুর্ব্বৃত্ত ইহুদীর মুখের গ্রাস, এমনি করে ছিনিয়ে আনব তার মুখ থেকে—

ইভা — এডল্ফ্, এডলফ্, উত্তেজনা তোমার ভাল নয় এডল্ফ্—
হিটলার—না ডিয়ার, আমি উত্তেজিত হব না। [একটু দম লইয়া]
হের বোসে, ভারতবর্ষকে আমার নিউ অর্ডার দেব। আমার নিউ অর্ডার ভারতের সকল দুঃখ মোচন করবে। যদি কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করে তবে কীটের মত তাকে পদদলিত করে যাব। ইহুদী বর্ব্বর যদি লক্ষ প্রাণ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়ায়, তবু তার নিস্তার নেই। টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেল্‌ব। তারপর, শকুনির ভক্ষ্য সেই গলিত শবকে আমি—আমি পদাঘাত করব—আমি—

[ইভা সসব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইতেই]

না আমি উত্তেজিত হব না।

আচ্ছা হের বোসে, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ হল। আমি এখন বড় ব্যস্ত। হের রিবেন্‌ট্রপ্‌কে পাঠাব, কথাবার্ত্তা সব সেই বলবে।

তৃতীয় দৃশ্য

[বার্লিন। সুভাষচন্দ্রের বাসভবন সোফিয়েন্‌ট্রাস। সুভাষচন্দ্র সর্দ্দার অজিত সিং ও ডাক্তার ব্যানার্জ্জী।]

সুভাষ — কিছুই বলতে দিলে না। কথার তোড়ে সব ভাসিয়ে দিলে।— মতলবটাও ঠিক বুঝলুম না। রিবেন্‌ট্রপ্‌কে পাঠাবে বলেচে কথাবার্ত্তার জন্য। ওর চোখে যে দৃষ্টি দেখেছি তাতে মনে হয় আমাকে সে মিত্রই ভাবে। আবার দেখা হবে ইঙ্গিত দিলে। [মৃদু হাসিয়া] বেশ আছে লোকটা! আত্মকাহিনী পাঁচকাহন করে গেয়ে বেড়াতে এতটুকু সঙ্কোচ দেখলুম না।

ব্যানার্জ্জী—ও চিরদিনই ডিমাগগ্। আপনার সম্বন্ধে এখনও মনস্থির করতে পারেনি সে জন্যই ও রকম করচে।

সুভাষ — কি হবে মনে হয় ডাঃ ব্যানার্জ্জী ?

ব্যানার্জ্জী—অপেক্ষা করুন নেতাজী। ধৈর্য্য হারাবেন না। রিবেনট্রপ শীঘ্রই দেখা করতে আসবে।

অজিত সিং—কথাটা কি জানেন, এদের পররাষ্ট্র বিভাগে দুটো দল আছে। একদল ইংরেজের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলতে চায়। তারা মোটেই ইংরেজ বিরোধী নয়, ইংরেজ বিরোধী কোন কাজের পক্ষপাতী ও নয়। ইংরেজের সঙ্গে তাদের অনেকটা স্বাজাত্যবোধ আছে। রুডলফ হেস্ ছিল ঐ দলের নেতা। ঐ দলের প্রতিনিধি হয়েই হেস্ পালিয়ে ইংলণ্ডে চলে গেছে। হেস্ চলে যাওয়াতে ইংরেজের এই স্বগোত্র দলটি কিছুটা প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলেচে বটে, কিন্তু পররাষ্ট্র বিভাগে এখনও ওদের যেটুকু প্রভাব আছে তা সামান্য নয়। আপনাকে ওরা ভয়ঙ্কর ইংরেজ বিদ্বেষী বলেই জানে। সেজন্য স্বাধীনভাবে আপনাকে কিছু করতে দিতে ওরা একেবারে নাবাজ।

সুভাষ — আর, অন্য দলটি ?

অজিত —অন্য দলটি হল জার্ম্মানীর মিলিটারিষ্ট দল। ওরা আপনাকে হাতেই তুলবে না। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ওরা ইংরেজকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে নিজবাহুবলেই ভারতবর্ষ অধিকার করতে পারবে।

সুভাষ —গেবেল্স্ বোধ হল মিলিটারিষ্ট দলের লোক। ও চায় আমি ভারতবর্ষের পঞ্চমবাহিনী গড়ে তুলি। চোখ দুটো ছানাবড়া করে শাসালে, বললে, ভাল চাও তো আমরা যা বলি তা কর।

ব্যানার্জ্জী—গেবেলস্ হিটলারের বিশ্বস্ত অনুচর। ও কোনো দলেরই নয়। আসলে হিটলারই আপনাকে বাজিয়ে দেখচে।

সুভাষ —তাই নাকি ? সেজন্যই বুঝি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদ মস্তক দেখে নিচ্ছিল। এদিকে বক বক করে যাচ্ছে, ওদিকে আমাকে ওজন করে নিচ্ছে, নয় ?

ব্যানার্জ্জী—হ্যাঁ। শুনেছি, ও তাই করে।

অজিত —যাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যাবে বলে ওর ধারণা হয় তাকে ও কিছুতেই ছাড়ে না।

সুভাষ —বটে ? আমি বুঝতেই পারি নি ! তা হলে তো কাল বিলম্ব না করে পাল্লাটা যাতে ভাবী হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়।—জানো, যারা কাজ চায় তাদের কাছে কাজ না দেখালে চলে না। আবার, কাজ দেখাতে পারলে তাদের কাছে নিজের কাজটিও আদায় করা যায়।

ব্যানার্জ্জী—হিটলার সবই জানে। কাবুল থেকে রওনা হয়ে আজ অবধি ইউরোপে আপনি যা যা করেচেন তার তুচ্ছতম সংবাদটিও নানা-ভাবে তার কাছে পৌঁছেচে। তাছাড়া ভারতের সংবাদও সে মোটামুটি জানে। আপনি যে ভারতের সম্মিলিত বিপ্লবী দলের নেতা তা তার অজানা নেই। ইংরেজের জটিল ব্যূহ ভেদ করে আপনি যে নিরাপদে বার্লিনে চলে আসতে সক্ষম হয়েচেন তাতেই সে আপনার ক্ষমতার পরিচয় পেয়েচে। আপনাকে সে হাতছাড়া করবে না।

অজিত —রাষ্ট্রসচিব কেপ্‌লার হিটলারের কাছে আপনার খুব প্রশংসা করেচে। ভারতে ইংরাজের মিলিটারি সংস্থান আপনি যেভাবে এঁকে দেখিয়েচেন বার্লিন ও রোম মহলে তার খুব তারিফ হয়েচে। ফন্‌ ট্রট্‌ তো আপনার মন্তব্যগুলো দেখে হিটলারকে বলেচে শুনলুম যে আপনি মিলিটারি জিনিয়াস্‌। রোমে বোসে সব শুনলুম। সিনর্‌ মুসোলিনী চিয়ানোকে পাঠাবে আপনার কাছে।

সুভাষ —এরা কাজ ফুরোলে পাঁজী করবে না তো?

অজিত—কাজ ফুরোলে কি আর আপনাকে এতদিন অম্নি থাকতে দিচ্ছে? আমাকে তো টিঁকতেই দিলে না। রোমে কিন্তু ইংরেজ বিরোধীদের খুব খাতির।

ব্যানার্জ্জী—কিভাবে আপনাকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবে তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

সুভাষ —হুঁ! তাই করুক। যে কটা দিন সময় পাওয়া যায়!—ভারতের বাইরে ও ভিতরে এক অখণ্ড স্বাধীনতা যুদ্ধ উদ্‌যাপন করবার মহাব্রত আমরা গ্রহণ করেচি। গান্ধীজীর ওতে আস্থা নেই, কিন্তু আমার আছে। আমি জানি মুক্তি ফৌজ না হলে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত সফল হয় না। দেশ যখন প্রস্তুত হয়, তখন সে মুক্তি সেনার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। সেই মুক্তিসেনা একদিন সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে কোথা দিয়ে এসে পড়ে। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, তাই ঘটেচে। আর্মি অব্ লিবারেশন্ এসেচে, তবেই দেশ স্বাধীন হয়েচে। আমি জানি দেশ আজ প্রস্তুত। ভারত ছেড়ে আসবার আগে নানাভাবে তা প্রত্যক্ষ করেচি। দেশ আজ জেগেচে, আজ তার মুক্তি ফৌজ চাই। আমাদের প্রধান কাজ সেই মুক্তি ফৌজ ভারতে পৌঁছে দেওয়া।—[একটু থামিয়া] জার্ম্মানীর সঙ্গে কি পন্থা অবলম্বন করলে এই সম্বন্ধে কতটুকু আদায় করা যাবে তা নিয়ে আমিও মাথা ঘামাচ্ছি ব্যানার্জ্জী। আমি টোপ ফেলব। যদি খেলিয়ে না তুলতে পারি তবে সর্দ্দার অজিত সিং এর আশ্রয়ে রোমে কাজ সুরু করব। যদি প্রয়োজন হয় আমি সারা পৃথিবীর দোরে দোরে যাব।—

[ভারতীয় ছাত্র হাসান, ভবেশ, গোরা ও ব্রজলালের প্রবেশ]

হাসান—ইউরোপের যেখানে যে ভারতীয় আছে সবাই সাড়া দিচ্ছে, নেতাজী।

ভবেশ —আমরা দোরে দোরে ধর্ণা দিয়ে ওদেব বাজী করিয়েচি।

গোরা — আমরা বুঝিয়ে দিয়েচি, কপাল ঠুকে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘে যোগ না দিলে ঘরে বসে কপালে করাঘাতই ভবিতব্য।

ব্রজ — আমরা বলেচি, তোমাদেব লজ্জা করে না বৃটিশেব ক্রীতদাস বলে পরিচয় দিতে ? ঐ ঘৃণ্য নামটা নিজেদেব পাশপোর্ট থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাও না ? তবে এখনও বসে আছ কেন ? আজাদ হিন্দ সঙ্ঘে যোগ দাও।

হাসান—জগতের সবাই ধিক্ ধিক্ করচে। পরাধীন জাতির আবার মান, তার আবার মর্য্যাদা! এস, সঙ্ঘে যোগ দাও।

ভবেশ —মেয়েগুলো পর্য্যন্ত নাক সিঁটকায়! ছি ছি, তবু বসে আছ?

গোরা —লোকের চোখে হেয় হয়ে, নগণ্য হয়ে, পশুর অধম হয়ে কে বেঁচে থাকতে চায়? এসো, কাজে নাবো।

ব্রজ — আমাদের সব আছে তবু পরাধীন বলে আমরা দুনিয়ার চোখে কত তুচ্ছ হয়ে আছি, তা দেখচ না?

হাসান —হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, সবাইকে আমরা বুঝিয়ে দিয়েচি, তোমরা জগতের চোখে হিন্দু, মুসলমান, শিখ নও, তোমরা পর-পদানত কৃষ্ণকায় নেটিভ, তোমরা সাদা চামড়ার উমেদারি করে বেঁচে আছ।

সুভাষ — শোন, শোন, ধর্ণা দিতে হয়েছিল কেন? কারো আপত্তি ছিল নাকি?

ভবেশ —আপত্তি ছিল না আবার? জাহাজ বোঝাই ওজর আপত্তি। সে

আমরা লোপাট করে সব পাচার করে দিয়ে এসেচি।

সুভাষ —কি বলছিল ওরা ?

গোরা — এই বলছিল, আজাদ হিন্দ সঙ্ঘটা কি ? ওতে যোগ দিলে কি হবে ? ওটা দেশ স্বাধীন করবে কি করে ? সিপাই বিদ্রোহের মত এত বড় লড়াইটা একগুঁতোয় যারা ঠাণ্ডা করে দিলে তাদের সঙ্গে ঢাল নেই তলোয়ার নেই আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ লড়বে কি করে ?

সুভাষ —তোমরা কি বললে ?

ব্রজ — আমরা বললুম, সিপাই বিদ্রোহ যখন হয়েছিল তখন দেশে কংগ্রেস ছিল ? সিপাই বিদ্রোহ থেমে গেল দেশ জাগে নি বলে।

হাসান —আমরা বললুম, আইয়াব কি করে স্বাধীন হল ? ডি ভেলেরার হাতে কটা সিপাই ছিল ?

ভবেশ —আমরা বললুম, ঢাল তলোয়ার মাটি থেকে গজাবে নাকি ? আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ তো ঢাল তলোয়ার যোগাড় করবার জন্যই করা হল।

গোরা — আমরা বললুম, হাত পা গুটিয়ে বসে না থেকে সবাই মিলে পরামর্শ করে একটা স্থির করা উচিত নয় কি যে এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আমরা কিছু করতে পারি কিনা। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ হল সেই সব শলা পরামর্শের স্থান।

ব্রজ — সবাই বললে, সুভাষচন্দ্র নিজে যখন আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ করেচেন তখন আর কথা নেই। কংগ্রেসের সভাপতি তিনি, বিপ্লবীদলের সকলের নেতা তিনি, তাঁর আহ্বান আমরা মানি।

হাসান —আমরা তখন বললুম, বেশ, বেশ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াও, এই নেতাজীর আহ্বান।

ভবেশ—জাতি, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াও, এই নেতাজীর বাণী।

গোরা — তোমাদের মিলিত শক্তি আমার হাতে এনে দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব, এই নেতাজীর প্রতিশ্রুতি।

ব্রজ — সব শুনে তখন সবার কি উৎসাহ? নিজেরা যেচে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এল। অন্য সবাইকে নিজেরাই বোঝাতে লাগল।

ভবেশ —কমিউনিষ্টরা বললে, আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম করচে কেন? ওটা কি ফ্যাসিষ্ট সঙ্ঘ? আমরা ফ্যাসিষ্ট বিরোধী, ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

হাসান—আমরা বললুম, দেশের স্বার্থ তোমরা দেখবেনা? দেশের প্রতি এ্যালিজিয়েন্স নেই তোমাদের? তবে কংগ্রেস ক্রীড্ মেনে নিয়েচ কেন?

গোরা — আমরা বললুম, দেশের স্বার্থ যদি তোমাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় তবে তোমরা দেশদ্রোহী।

ব্রজ — আমরা বললুম, দেশই যদি হাতের বাইরে থেকে যায় তবে প্রলিটেরিয়েট্ রাজ তোমরা কোথায় করবে? কামাস্কাট্‌কায়?— সেখানেই যাও না!

ভবেশ —আমরা বললুম, সাম্রাজ্যবাদ তোমরা ধ্বংশ করতে চাও না? বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াবার জন্য নেতাজী তোমাদের ডেকেচেন।

হাসান — তখন ওরা বললে, নেতাজীকে আমরা মানি। কংগ্রেসের সব বিপ্লবীদের তিনি সার্বভৌম নেতা। যতদিন আমরা কংগ্রেসের বিপ্লবীদলে আছি ততদিন তাঁর আদেশ আমাদের মানতেই হবে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা এক হয়ে দাঁড়াতে প্রস্তুত। রুশিয়া ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে সন্ধি করেচে, নেতাজীর আহ্বানে আমরা ফ্যাসিষ্টদের সঙ্গে সন্ধি করলুম।

সুভাষ — উত্তম। একতার বাণী তোমরা সফল করেচ। বিপ্লবের প্রথম সোপান ইত্তেহদ্ তোমাদের অক্লান্ত চেষ্টায়, অকৃত্রিম দেশপ্রেমে, আজ তোমরা দেখ্‌তে দেখ্‌তে উত্তীর্ণ হয়ে এলে। এবার এতমদ্ চাই, বিশ্বাস আনতে হবে। প্যারিসে, রোমে, যেখানে যে ভারতীয়কে পাবে বার্লিনে তাকে আহ্বান কর। আজাদহিন্দ্ সঙ্ঘের বিরাট অধিবেশন করব। আর বিলম্ব নয়। ভারতের স্বাধীনতায় বিশ্বাস যদি জাগিয়ে তুলতে পারি, এতমদ্ যদি আসে, তবে ইংরেজের স্বগোত্র জার্মানকে আমি একটা প্রবল নাড়া দেব।

চতুর্থ দৃশ্য।

[বার্লিন। সোফিয়েন্‌ষ্ট্রাস্। হের্ ফন্ রিবেনট্রপ, কাউন্ট চিয়ানো, জেনেরেল ওসিমা ও সুভাষচন্দ্র।]

রিবেনট্রপ—ফুয়েরের আমাদের আপনার কাছে পাঠালেন আমি রিবেন্‌ট্রপ, ইনি চিয়ানো, ইনি জেনেরেল ওসিমা। আমাদের নাম আপনি শুনে থাক্‌বেন।

সুভাষ — বিলক্ষণ, হের রিবেনট্রপ্, আপনাদের নাম বিশ্ববিদিত। কে না জানে? আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক্। বসুন!—

[সকলেই স্ব স্ব অভিবাদন করিলেন ও উপবেশন করিলেন।]

চিয়ানো—শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে আপনি ভারতবর্ষ থেকে এতদূর এসে পড়েচেন শুনেই সিনর মুসোলিনি চকৎকৃত হয়েছিলেন। হের রিবেনট্রপ ও আমি সিনর মুসোলিনির সঙ্গে আপনার বিষয় আলোচনা করেচি। তিনি কিছুতেই আপনাকে ভারতবর্ষে ফিরে পাঠাতে প্রস্তুত নন। হের গেবেল্‌স্ যে প্রস্তাব করেছিল, তিনি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। আপনি গেবেল্‌স্‌এর প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে তাঁর শ্রদ্ধাই অর্জ্জন করেচেন।

রিবেনট্রপ্—তিনি বলচেন, আমাদের মিত্রকে যদি আমরাই শত্রুর হাতে তুলে দিই, এমন অদ্ভুত সাহসী, এমন বুদ্ধিকৌশল সম্পন্ন লোকটিকে নিজেদের কাজে না লাগিয়ে শত্রুর বিবরে ঠেলে দিই, তবে ক্ষতি তো আমাদেরই। এঁকে একবার হাতে পেলে বর্ব্বরগুলো কি আর আস্ত রাখবে যে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে ইনি পঞ্চমবাহিনী গড়ে তুলবেন?

সুভাষ — [হাসিয়া ফেলিলেন] সিনর মুসোলিনি দেখ্‌চি আমাকে ইংরেজের স্পাই বলে সন্দেহ করেন। তাঁকে দোষ দিই নে। পরাক্রান্ত বৃটিশব্যূহের বজ্রমুষ্টি ভেদ করে সহায় সম্বলহীন এক সামান্য ভারতবাসী যে অক্ষত শরীরে বিপক্ষ শিবিরে এসে পৌঁছুতে পারে, সে কথা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। কাজেই অনুমান করা যায় যে বৃটেনই নিজের প্রয়োজনে তার মুঠোটি শিথিল করে দিয়েছিল। বৃটেনের প্রয়োজন সাধন করে সে লোকটি ভারতবর্ষে ফিরে যাবে, আর সে কাজে তিনিই হবেন প্রধান সহায়, তা ও কখনো হয়!

চিয়ানো—একি বলচেন আপনি? আপনাকে স্পাই ভাবেন সিনর মুসোলিনি? কি যে বলেন?

সুভাষ -- 'সিনর মুসোলিনি কে একটা কথা জানিয়ে দেবেন যে ভারতবর্ষে কংগ্রেস বলে যে প্রতিষ্ঠান আছে আমি তারই সেবক। ভারতের স্বাধীনতা সেই কংগ্রেসের মূলমন্ত্র। ভারতের স্বাধীনতার যারা শত্রু, কংগ্রেসেরও তারা শত্রু। আজ কুড়ি বৎসর কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত আছে। কংগ্রেসের সেবকরূপে সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে আমিও নিযুক্ত আছি। সেজন্য একাদশবার কারারুদ্ধ হতে হয়েচে, কত লাঞ্ছনা, কত উৎপীড়ন সইতে হয়েচে। কংগ্রেসের অধিনায়ক গান্ধীজী সম্মুখ সমরই জানেন, সম্মুখ সমরই উপদেশ করেন, সম্মুখ সমরেই আহ্বান করে আসচেন চিরদিন। মানুষের ন্যায্য অধিকার অন্যায় পথে লাভ করতে হবে এমন কথা তিনি স্বীকার করেন না। ন্যায় পথেই ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এই তাঁর মত, এই তাঁর চরম নির্দ্দেশ। বিশ্বাসঘাতকতার মত নীচ মনোবৃত্তির স্থান কংগ্রেসে নেই। সে যা করে, সকলের চোখের সামনেই করে, সকলের কর্ণ গোচর করেই তা করে, অন্ধকারের জীব সে নয়। কাবুল থেকে নাৎসী গুপ্তচর আমার অনুসরণ করে আসচে। রোমে, প্যারিসে, বার্লিনে কোথাও তারা রেহাই দেয়নি। আমি বলি, শুধু বাইরে কেন, আমার অন্দরে বাইরে সর্ব্বত্র গুপ্তচর থাক্। আমার সব কথা সব কাজ আপনাদের কর্ণগোচর হোক্। আমি বিন্দুমাত্র আপত্তি করব না।

বিবেনট্রপ—কেন আমাদের প্রতি অযথা অবিচার করচেন হের বোসে? ভারত কংগ্রেসের আপনি প্রেসিডেন্ট। বর্ব্বর ইংরেজ আপনার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করেচে তা কি আমরা কিছুই

জানিনে? জেনেরেলে ওসিমা একটু আগেই বলছিলেন যে আপনি কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে না এলে ওরা নানা অজুহাতে আপনাকে আবার জেলে পূরে ফেলত। পরশ্রীকাতর, নীচাশয় ইংরেজ জাতি যেমন আমাদের শত্রু তেম্নি আপনার ও পরম শত্রু। সেই ইংরেজের স্পাই হবেন আপনি? ছি, ছি, ও কথা আমরা কখনও ভাবতে পারি?

সুভাষ — ইংরেজ জাতি আমার শত্রু এমন কথা তো আমি বলি নে। ভারতের স্বাধীনতার যারা শত্রু তারাই আমার শত্রু। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ আমার শত্রু, ভারতের বুকে সে—সাম্রাজ্যবাদ যত শাখা প্রশাখা ছড়িয়েচে তারা আমার শত্রু, ভারতের স্বাধীনতায় যারা হস্তক্ষেপ করচে তারাই আমার শত্রু। ইংরেজ মাত্রই আমার শত্রু হবে কেন?

ওসিমা —ইংরেজ মাত্রই আপনাদের শত্রু মিঃ বোস, ইংরেজ জাতটাই আপনাদের শত্রু। যে হাত পিঠে ছোরা বসাচ্ছে সে-হাতটাই তো শত্রু নয়, সে-হাত যে মানুষটির অঙ্গ সে-মানুষটাই শত্রু। প্রয়োজন হলে গোটা মানুষটাই সে-হাতের সাহায্য করবে। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের পেছনে গোটা ইংরেজ জাতটাই রয়েচে। প্রয়োজন হলে সমগ্র ইংরেজ জাতটাই এগিয়ে আসবে ইংরেজ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য।

সুভাষ – জাতই যদি ধরতে হয়, জেনেরেল ওসিমা, তবে সারা পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের একটা আলাদা জাত আছে। নীপণ সাম্রাজ্যবাদীই হোক, রোমক সাম্রাজ্যবাদীই হোক, আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীই হোক, ওরা সব একই জাত। একই তাদের প্রকৃতি। একটি সাম্রাজ্য কারো হস্তচ্যুত হতে দেখলে যতক্ষণ না তাকে নিজের জঠরে পূরে ফেলা যায় ততক্ষণ এদের দুশ্চিন্তার সীমা

থাকে না। কেউ নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করচে দেখলে এরা যদি বা ভাগ বসাতে আসে কখনও বাধা দেয় না।

বিবেনট্রপ্—[উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন] জার্ম্মানী যুদ্ধ করচে তার ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবার জন্য। সাম্রাজ্য কামনা সে করে না।

সুভাষ—বলুন, আপাততঃ করে না। শত্রুকুল ধ্বংস করে যখন সব পথ খোলা পাবেন তখন হাত দেখাবার প্রচুর সময় আপনারও হবে। এটা বোঝা কি খুবই শক্ত?

(বিবেনট্রপ্ ম্লানমুখ হইলেন। কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ বসিয়া রহিলেন)

চিয়ানো—আচ্ছা, তাই। তর্কের খাতিরে আপনার কথাই যদি মেনে নিই, তবে আপনাকেও তো স্বীকার করতে হয় যে ইটালীয়ান্, জার্ম্মান অথবা জাপানী মাত্রই আপনার শত্রু নয়, আমরা আপনার মিত্রও তো হতে পারি? উপস্থিত, বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্য আমরা যুদ্ধ করচি। কেন আপনি ধরে নিচ্ছেন যে ওটা সাম্রাজ্য-বাদীর লড়াই, একটি অপরটির সাম্রাজ্য কামনা করেই লড়াই করচে? অন্যরকমও তো হতে পারে? একটা সাম্রাজ্য ধ্বংস করে ফেলা কি সাম্রাজ্যবাদীর নিজের স্ফীতির জন্যই প্রয়োজন? আপনি কি বলতে চান যে সাম্রাজ্যবাদের যারা বিরোধী তারা সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে অনিচ্ছুক?

সুভাষ—না, তা বলিনে। সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে আমি ও চাই।

চিয়ানো—বেশ!!—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করার কাজে আমরা আপনার সহযোগিতা প্রার্থনা করচি। বিনিময়ে বৃটেনের কবল থেকে ভারতের মুক্তিযুদ্ধে আমরা সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করতে প্রস্তুত আছি।

সুভাষ—কিন্তু সকল সাম্রাজ্যবাদেরই আমি শত্রু সে কথাটা ভুলবেন না।

চিয়ানো—না, না, তা ভুলব না। ওতেই আমাদের কাজ চলে যাবে।

রিবেনট্রপ—না, না, আর কোন কথা শুনব না। এই কাজে আপনার পূর্ণ সহযোগিতা আমরা দাবী করচি।

চিয়ানো—সিনর মুসোলিনি আমাদের প্রচারকার্য্যে আপনার বিশেষ সাহায্য প্রার্থনা করেন। আপনি সেই কাজ গ্রহণ করুন।

সুভাষ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য?

চিয়ানো—হ্যাঁ।

সুভাষ—আনন্দের সঙ্গেই তা গ্রহণ করব।

রিবেনট্রপ—ধন্যবাদ হের বোসে! আইয়াবের ডি ভেলেরা আমাদের বিশেষ অনুরোধ করেচেন যেন বার্লিনে আপনার উপস্থিতির পুরো সুযোগ আমরা গ্রহণ করি। তিনি বলেচেন তিনি আপনাকে ভাল করেই জানেন। আপনার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে যদি আমরা কার্পণ্য করি তবে আমরাই ঠকে যাব। আচ্ছা, এই কথাই রইল। আমরা সকলকে জানিয়ে দিই গে। মূর্খ গেবেল্‌সটা সব গোলমাল করে দিচ্ছিল।

সুভাষ—জার্ম্মানী ও ইটালীর প্রচার বিভাগ ইউরোপে যে প্রচারকার্য্য করচে তার বেশী আমি আর কি করতে পারি। এশিয়াতেও জাপানী প্রচার বিভাগ বেশ উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গেই কাজ করে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কংগ্রেস যে প্রচার কার্য্য চালাচ্ছে তাও অপ্রচুর নয়। তবে, ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালানো যাচ্ছে না। ভারতের অভ্যন্তরে সেটা সম্ভব হয় নি, কিন্তু ভারতের বাইরে থেকে হয়তো অসম্ভব নয়।

চিয়ানো—(সোৎসাহে) তাই বলুন। অসম্ভব কেন হবে? কার সাধ্য বার্লিনে আপনাকে নিরস্ত করে?

রিবেনট্রপ—(ব্যগ্র ভাবে) গুরখা, শিখ, পাঞ্জাবী, জাঠ, সব সৈন্যদের

মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিতে পারবেন? ইংরেজের হাত থেকে এই রেজিমেন্টগুলি ছাড়িয়ে আনতে পারবেন? সত্যি ওটা পারা যাবে? তবে আর ভাবনা কি! আপনাকে সাহায্য করবার জন্য আমরা কি করতে পারি অসঙ্কোচে বলুন। যা চাই সব দেব। আপনি ওটা করুন।

সুভাষ—তাই হবে। কংগ্রেস কোন ফাঁকেই সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারচে না। ভারত কর্ত্তৃপক্ষের সামরিক নীতি সৈন্যদের দেশ থেকে চিরদিন বিচ্ছিন্ন করে রেখেচে। বহুদিন থেকেই অতি তীক্ষ্ণ সদা জাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে ওরা সৈন্যদের ঘিরে রেখেচে। ওরা জানে যে কংগ্রেস ও ভারতীয় সৈন্য যদি কখনও মিলিত হয় তবে ভারত আর একদিনও পরাধীন থাকবে না। সেজন্যই নানা অজুহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ওরা সৈন্যদলে গ্রহণ করচে না, দূরে দূরে সরিয়ে রাখচে। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, পল্লী অঞ্চলের লোক দিয়ে সৈন্য গড়ে তুলচে আর, ছোট বড় সব সেনানায়কের কাজ নিজেরাই একচেটে করে রেখেচে। দুর্ভাগা ভারতীয় সৈন্যগণ নিজের দেশকে চেনে না, আপন পর চেনে না, শুধু জানে তাদের ভাল রুটি আসচে ইংরেজ সেনাধ্যক্ষের হাত দিয়ে। দুবেলা যে তারা খেতে পরতে পাচ্ছে সে শুধু ইংরেজ সেনাপতির জন্য। সে ইচ্ছে করলেই তাদের রাখতে পারে, ইচ্ছে করলেই তাড়িয়ে দিতে পারে। সে-তাদের একমাত্র প্রভু। তার মন যুগিয়ে চলতে পারলে সব হবে। নইলে. বেকার হয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে। এমনি করে অন্ধ প্রভুভক্তি তাদের অস্থি-মজ্জায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েচে। প্রভুরা যেটুকু দেশের সংবাদ তাদের দিতে ইচ্ছে করে, সে টুকুই তারা পায়। তার বেশী কিছুই জানবার, তাদের উপায় নেই। ফলে, যন্ত্রের মত প্রভুর

আজ্ঞায় তারা কাজ করে যাচ্ছে। করে করে এমন অভ্যস্ত হয়েচে যে সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশে কথাটি না কয়ে প্রভুর আজ্ঞায় প্রাণ দিতে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কার লড়াই, কেন লড়াই, কিসের লড়াই, ও সব তাদের গণ্যই নয়!—চতুর সাম্রাজ্যবাদী! সাবধান! এবার তোমার অস্ত্রেই তোমাকে নিপাত করব। যে অন্ধ প্রভুভক্তি তোমার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে এদের মধ্যে জাগিয়ে রেখেচ, সেই অন্ধ প্রভুভক্তিই আমি কাজে লাগাব। এদের সত্যিকার প্রভুকে চিনিয়ে দেব। এমন করে চিনিয়ে দেব যে চিরদিনের জন্য এদের চোখ খুলে যাবে, আর স্বপ্নেও ভুল হবে না। তখন তোমারই সযত্ন পরিপুষ্ট অন্ধ প্রভুভক্তি তোমারই সাম্রাজ্য লিপ্সা চিরতরে ঘুচিয়ে দেবার জন্য তেমনি অন্ধ বেগে ধাবিত হবে। তোমার প্রয়োজনে গঠিত এই বিরাট সৈন্যবাহিনী তখন আমারই আরমি অব্ লিবারেশন্ হয়ে উঠবে। ভারতের এই মুক্তি ফৌজ তখন সারা ভারতের উন্মুখ প্রতীক্ষা সফল করে ভারত স্বাধীন করবে।—হ্যাঁ, হের রিবেন্‌ট্রপ, এরাই হবে ভারতের মুক্তি ফৌজ।

রিবেন্‌ট্রপ—[প্রবল উৎসাহে] চমৎকার আইডিয়া! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি আপনি সফল হবেন। ওঃ, কি মজাটাই হবে!।— হতভাগা গেবেলস্‌টা সব মাটি করে দিত।

সুভাষ—যে সব ভারতীয় সৈন্যদের আপনারা আফ্রিকায় বন্দী করেচেন তাদের সব ভার আমার উপর ছেড়ে দিতে হবে। তাদের নিয়েই কাজ সুরু করব। ভারতবর্ষে যারা আছে, আর যুদ্ধক্ষেত্রে যারা রয়েচে, তাদের কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছে দেবার কি উপায় করব এখনও তা ভেবে দেখি নি। কিন্তু বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আর বিলম্ব করব না। তাদের নিয়েই আমার

প্রধান কাজ। প্রচার বিভাগের অন্য কাজে আপনারা যখনই আমাকে ডাক দেবেন তখনই উপস্থিত হব। আপনারা রাজী আছেন?

ওসিমা—বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের সব ভার আপনার হাতে তুলে দিতে হবে?—কথাটা একটু নূতন নয়? এর সবদিক বিবেচনা না করে একটা মতামত কি করে দেওয়া যেতে পারে মিঃ বোস্?—আমরা প্রচার কর্য্যের জন্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা চাই, আপনি আমাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্যকে সমর্থন করেন এবং সে-উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আমাদের একযোগে কাজ করতে ও প্রস্তুত আছেন। বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের সবভার আপনার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে কি না সে-কথাটা কি এই সম্পর্কে খুবই জরুরী? এর একটা মীমাংসা না হলে আপনি সাহায্য করতে অসম্মত?

সুভাষ—আমাদের উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য আমার সহযোগিতা আমি অঙ্গীকার করেচি। আপনারা যা স্থির করে দেবেন কেবল সে-টুকুই আমি করতে পার তেমন প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ তো সহযোগিতা নয়। কার্য্যপদ্ধতি, হয় আমরা সকলে মিলেই স্থির করব, নয়তো যার যার বিশেষ কাজ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবেই করে যাব, সেইটে হয় সহযোগিতা। আমি একটা বিশেষ কার্য্যভার নিতে চেয়েছিলুম এই জন্য যে বিদেশ থেকে এসে হঠাৎ আপনাদের গোটা কার্য্যপদ্ধতির এতটা অন্তরঙ্গতা কেউ সুনজরে দেখবে না। তা ছাড়া, আমাদের বিভিন্ন আদর্শ একই উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করেচে বলেই তো আর অভিন্ন হয়ে যায় নি!

ওসিমা—সহযোগিতার ক্ষেত্রে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েও আমাদের মতামত একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন না, মিঃ বোস। যে

কাজটা আমাদের দিয়ে করিয়ে নেবেন, সে কাজের সবটুকুই আমি বুঝতে চাই। ধরুন, বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের সম্পূর্ণ ভার আপানকে দিলুম। আপনি তাদের নিয়ে কি কাজে লাগাবেন, সে-কাজ আমাদের স্বার্থ সাধন করবে কি স্বার্থ-বিরোধী হবে, সেটা ভাল করে না বুঝেই—

সুভাষ—ভারতীয় সৈন্যদের ভার কেন আমায় দেবেন, এই আপনার জিজ্ঞাস্য। হের গেবেলস্‌কে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি স্বাভাবিক নেতৃত্ববাদ সম্বন্ধে নাৎসী মতামতটা আমাকে কি বুঝিয়ে ছিলেন। নাৎসীবাদের যদি কোনো-মূল্য থাকে, তবে আমি জিজ্ঞাসা করব ভারতীয় সেনার স্বাভাবিক নেতৃত্ব ভারতীয় নেতার নয় কি?

ওসিমা—আপনি ভুল করচেন মিঃ বোস্‌। নাৎসীরা ইউরোপের জন্যই স্বাভাবিক নেতৃত্বের কল্পনা করেচে, এশিয়ার জন্য নয়। ওটা থার্ড ইন্টারনেশনেল এর প্রত্যুত্তর মাত্র। রুশিয়া তার সাম্য-বাদের মায়াজালে পাছে গোটা ইউরোপটাকে বশ করে ফেলে সে জন্যই স্বাভাবিক নেতৃত্ববাদের উদ্ভব হয়েচে। অর্থাৎ, নিজের দেশে যা খুশী কর, পরের দেশে বাহাদুরী করতে এস না, সেটা কেউ সইবে না।

রিবেনট্রপ—কখনো না, হের বোসে, স্বাভাবিক নেতৃত্ববাদে আমরা বিশ্বাস করি।—জেনেরেল ওসিমার ওটা ভারী অন্যায়, ও ভাবে বৃহত্তর পূর্ব্ব এসিয়ার প্রোপাগাণ্ডা করা।—জার্ম্মানী শত্রুর সঙ্গে যাই করুক, মিত্রের সঙ্গে কখনও প্রতারণা করে না।

চিয়ানো—আমি বলি, নাৎসীবাদ নিয়ে অত কথার প্রয়োজন কি? ইটালী, জার্ম্মানী, জাপান তিনটিতে মিলেই যখন কাজে নেবেচি, তিনটিতে মিলেই যখন এ্যাক্সিস্‌, তখন নাৎসীবাদ দিয়েই তো সব প্রস্তাব বিচার করলে চলবে না। নাৎসীবাদে নাৎসীরা আবদ্ধ

থাকুন। প্রস্তাবটাকে আমরা বিবেচনা করে দেখতে ক্ষতি কি?

বিবেনট্রপ্—বেশ, তাই করুন।

[সুভাষকে] আমি স্বাভাবিক নেতৃত্ববাদ মানি হের বোসে।

সুভাষ — বড় খুসী হলুম হের রিবেনট্রপ।—

[ওসিমা ও চিয়ানোকে] আপনাদের বলচি, ভেবে দেখুন, যে নেতা ভারতীয় সৈন্যকে তার সত্যিকার প্রভুকে চিনিয়ে দেবে, সে যদি নিজেই সে প্রভুকে না জেনে থাকে তবে সে বোঝাবে কি?— সৈন্যদের প্রাণের ভাষায় যদি সে কথা বলতে না পারে তবে সে বোঝাবে কি করে?—

সে জন্য, প্রচারের কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্যই এদের ভার আমার হাতে তুলে দিতে হবে। আর, সম্পূর্ণ ভার আমায় কেন দেবেন? যে নেতা এদের সত্যিকারের প্রভুকে চিনিয়ে দিচ্ছে তারই অন্য প্রভু রয়েচে সেটা এদের কাছে কেমন দেখাবে বলুন ত? তাতে এক মুহূর্ত্তে আমার সকল প্রচেষ্টাই কি এদের কাছে হাস্যকর হয়ে উঠ্‌বে না?—

সহযোগিতার ক্ষেত্রে তেমন বিড়ম্বনার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করা কি আপনাদের প্রধান কর্ত্তব্য নয়?

বিবেন্‌ট্রপ্—নিশ্চয় কর্ত্তব্য।

চিয়ানো—কথাটা সঙ্গত। ও দাবী আপনি করতে পারেন বৈ কি! আপনার হাতে আমাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ বলেই আমার ধারণা হচ্ছে। তা ছাড়া, আপনাকে না পেলে আমরা যা হারাব তা আর কোনো মতেই পূরণ হবে না। আপনি আর বৃথা সময় নষ্ট করবেন না। কাজ সুরু করুন।

ওসিমা —আমার একটা কৌতূহল নিবৃত্ত করবেন মিঃ বোস? এই সৈন্যদের আপনি কি কাজে লাগাবেন?

সুভাষ — যে কাজে লাগাব তার সম্পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করবে আপনাদের বিজয়বাহিনী ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে পারবে কি না তার উপর।

রিবেনট্রপ—কেমন, জেনেরেল ওসিমা, ওটা আমাদের স্বার্থ বিরোধী শোনাচ্ছে কি? চুপ করে রইলেন যে!—ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে চান না আপনি?

চিয়ানো—বড় কিছু করতে হলে বড় মন চাই। বড় রকম ছাড়তে হয় তবেই বড় কাজটি পাওয়া যায়। ঘুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে লাভ লোকসানের হিসেব করে কখনও বড় কাজ হয়? বুকের পাটা চাই।

ওসিমা —হুঁ!—

সুভাষ — আপনাদের সহানুভূতি লাভ করে আমার আশঙ্কা দূর হল। এবার খুব ভরসা নিয়েই কাজে নাবতে পারব। আপনাদের বিজয় বাহিনী যত দিন ভারতের সীমান্ত থেকে দূরে থাকবে ততদিন আমার সৈন্যরাই হবে আমাদের প্রাচার বাহিনী, জেনেরেল ওসিমা! আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে তারা অপর শিবিরের ভারতীয় সৈন্যদের সম্মুখীন হবে। আমি নিজে তাদের পরিচালনা করব। আমার এই সৈন্য বাহিনী আমি অপর শিবিরের ভারতীয় সৈন্যদের মুখোমুখি এনে দাঁড় করাব। আমি দেখে নেব জাগ্রত দেশভক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্ধ প্রভুভক্তি কতদিন টিকতে পারে, কেমন করে টিঁকতে পারে!!

রিবেনট্রপ—হা, হা, হা, হা, কি মজাটাই যে হবে! অকিনলেক, মণ্টগুমেরি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌বে তাদের সৈন্য হঠাৎ উধাও হয়ে যাচ্ছে—

জিবানো —এত তাড়াতাড়ি উধাও হচ্ছে যে অস্ত্র শস্ত্রগুলো ফিরিয়ে দেবারও অবকাশ পাচ্ছে না, তা নিয়েই চলে যাচ্ছে—

রিবেনট্রপ—হা, হা, হা, ওদেরই তৈরী সৈন্য, ওদেরই যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে অপর শিবিরে চলে যাচ্ছে আর সঙ্গীন উঁচিয়ে ওদেরই মার মার করে তেড়ে আসচে ! কি হুলুস্থূল কাণ্ড !! আর হতভাগা গেবেল্‌স টা কি না এমন যজ্ঞটিই পণ্ড করে দিতে বসেছিল !!

ওসিমা —চমৎকার সুভাষচন্দ্র, আমিও বলি চমৎকার ! এ এক নূতন খেলা ! আমার সবটুকু মন বলচে হুশিয়ার, এ গভীর জলে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোথা থেকে একটা জেদ্ মাথায় চেপে বসেচে আর বলচে, দেখাই যাক না।—ফলে এই হবে যে হুসিয়ারীর কান মন্ত্র খুব বেশীক্ষণ টিক্‌বে না, জেদ করেই আপনার দাবী ষোল আনা মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যাব।—তবে তাই হোক, আর আপত্তি করব না। ভারতবর্ষে ও রকম কটা লোক আছে জানিনে। যদি আর একটিও থাকে তবে ভারতবর্ষ আর বেশীদিন কারো সাম্রাজ্য থাকবে না।

পঞ্চম দৃশ্য

[বার্লিন, লিস্‌টেন্‌ষ্টাইন্‌ আলে। আজাদ হিন্দ্‌ সঙ্ঘ। সুভাষচন্দ্র ও সঙ্ঘের কর্ম্মীবৃন্দ।]

সুভাষ—[ব্যাঘ্র লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া] বার্লিনে স্বাধীন আজাদ হিন্দ্‌ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হল। ইত্তেহদ্‌ ও এতমদ্‌ মন্ত্রে যে শক্তি সঞ্চারিত হল তারই উজ্জ্বল প্রতীক হয়ে রইল এই স্বাধীন সঙ্ঘ। এবার কুরবাণী, আত্মাহুতির মন্ত্রে দীক্ষা লও। কুরবাণী দিয়ে তোমাদের সঙ্ঘকে রক্ষা কর, তাকে বাঁচিয়ে রাখ। স্বাধীনতার সব আশা, সব ভরসা এই সঙ্ঘকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত হোক্‌।

জার্ম্মানী এতদিনে আজাদ হিন্দ্‌ সঙ্ঘকে মেনে নিয়েচে। আজাদ্‌ হিন্দ্‌ সঙ্ঘ আমাদের নেতৃত্বে, আমাদের পরিচালনায়, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবে। তার আত্মকর্ত্তৃত্বে কেউ বাধা দেবে না। জার্ম্মানী কোন কারণেই তার কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। আজাদ হিন্দ্‌ সঙ্ঘ এদের কাছে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের মর্য্যাদা পেয়েচে। আমাকে এরা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের রাজদূত বলে মেনে নিয়েচে।— স্বাধীন ভারত যারা অকপটে মেনে নিলে তারা আমাদের পরম মিত্র। জার্ম্মানীর সঙ্গে সেই মিত্রতা যাতে সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমি এদের সঙ্গে সন্ধি করেচি। সেই সন্ধির প্রধান সর্ত্ত আজাদ হিন্দ্‌ সঙ্ঘকে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতে হবে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা এক হয়ে যুদ্ধ করব, রুশিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর যুদ্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাক্‌ব, জার্ম্মানী আমাদের

নিয়মিত অর্থ সাহায্য করবে এবং যুদ্ধের শেষে আমরা তা পরিশোধ করব।—

বিদেশে স্বাধীন জাতির মর্য্যাদা লাভ করেচ। মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। জার্ম্মান ফুয়েরের দিগ্বিজয়ী জার্ম্মান সেনানীকে নিজের মুখে নির্দ্দেশ দিয়েচেন মিত্রশক্তির অধিনায়কের যোগ্য সম্মান আমাকে দেখাতে ত্রুটি না হয়। জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে যথোচিত মর্য্যাদা দিচ্ছে। পরাধীন ভারতবাসীর যা ছিল স্বপ্নের অগোচর তা আজ সম্ভব হয়েচে। যে জন্য তা সম্ভব হল সেই ইত্তেহদ্, এতমদ্ ও কুরবাণীর মন্ত্র দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হও, সে মন্ত্র সাধনে তোমাদের যেন তিলমাত্র শৈথিল্য না ঘটে। যত বড় ইত্তেহদ্ ততবড় শক্তি, যতবড় এতমদ্ ততবড় কাজ, যত বড় কুরবাণী তত বড় সাফল্য। পৃথিবীর যেখানে যে আছ ভারতবাসী এই মন্ত্রে আজ দীক্ষা লও। মনে রেখো, নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত সবলের পদতলে নিষ্পিষ্ট ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে মুক্তি দিতে হবে। সেই বৃহৎ শক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে, সেই বৃহৎ কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে, সেই বৃহৎ সাফল্য অর্জ্জন করতে হবে।—

ভারতের নরনারী! আশ্বস্ত হও, নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়ে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে দাসত্বের বেদীমূলে আর আত্মবিক্রয় করো না, ভারতের মুক্তি ফৌজ এতদিনে জন্ম নিয়েচে। বিপ্লবের অগ্নিশিখা বহন করে শীঘ্রই সে তোমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে। ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ্, আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ্, জয় হিন্দ্!

সকলে —ইনক্লাব জিন্দাবাদ্, আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ্, জয় হিন্দ্।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

থাইল্যাণ্ড। ব্যাঙ্কক্।

আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের কর্ম্মপরিষদ।

সভাপতি—রাসবিহারী বসু

সদস্যগণ—রাঘবন্, মেমন্, মোহন সিং ও জিলানি।

রাঘবন্—আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের কর্ম্ম পরিষদ আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের নির্দ্দেশ মতই কাজ করবে। জাপানের ইয়াকুবো কিকান তার কাজে হস্তক্ষেপ করলে সে তা কিছুতেই সহ্য করবে না।

মোহন সিং—কখনও না। এত স্পর্দ্ধা এই ইয়াকুবো কিকানের যে আমাদের একটা মুখের কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা না করে আমাদেরই স্বরাজ প্রতিষ্ঠানের ছেলেগুলোকে রাতারাতি সাবমেরিনে করে ভারতবর্ষে পাঠায়! শুনতে পাই, ভারতবর্ষে জাপান সরকারের গুপ্তচর বৃত্তির কাজে তাদের লাগানো হবে। এইজন্যই কি আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল? আমার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈনিকদের আমি কি বলে প্রবোধ দেব? জাপানের ছাপ্পান্ন হাজার যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনিকের মধ্যে আজ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী সৈন্য স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিয়েচে। হিন্দুস্থান আজাদ্ হবে এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়েই তারা দলে দলে আজাদ

হিন্দ্ ফৌজেব পতাকাতলে সমবেত হয়েচে। পূর্ব্ব এশিয়ার দিকে দিকে যেখানে যত ভাবতবাসী আছে, সর্ব্বত্র সর্ব্বস্তরে আমাদের আজাদ হিন্দুস্থান বাণী নবজাগবণের বার্ত্তা বহন কবে পবনবেগে ছড়িয়ে পড়েচে। এতদূব এগিয়ে এসে আজ আর পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। স্বাধীনতাব জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে জাপানেব সঙ্গেও আমবা যুদ্ধ কবব। আমবা মৃত্যুভয় করি না।

জিলানি ইযাকুবো কিকানকে আমবা বুঝিয়ে দেব যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠান জাপান সবকাবেব গুপ্তচব তৈবী কববাব কাবখানা নয়। স্ববাজ প্রতিষ্ঠানেব একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের দেশসেবক তৈবী করা। ভাবতমাতাব চবণতলে যাবা সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিতে প্রস্তুত সেই সব দেশভক্ত ভাবতীয তরুণ পিনাঙ্ এব স্ববাজ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পাচ্ছে। বলা নেই, কওয়া নেই, একদিন গভীর রাত্রে একদল জাপানী অফিসাব গুটিকতক কিকানদপ্তবের কর্ম্মচাবী নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির। চটপট সব ছেলেদের একত্র কবে তাদেব মধ্যে সেবা ছেলেদেব বেছে নিযে ছুট করে দিল একটা লবীতে তুলে কোথায় বওয়ানা কবে, তাদেব আর খোঁজ নেই। স্ববাজ প্রতিষ্ঠানেব কর্ত্তৃপক্ষ জাপানী অফিসাবদেব দোরে দোবে ধর্ণা দিয়েও তাদের খোঁজ পেলে না। ওরা সবাই বললে, "আমবা এব কিছুই জানিনে।" আজ, এতদিন পরে, ওরা স্বীকাব কবচে যে সেই ছেলেদের জাপানী সৈন্যরাই ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাদেব সাবমেবিণে করে ভারত উপকূলে পৌছে দেওয়া হয়েচে। ভারতে গিয়ে তারা জাপান সমর বিভাগের স্পাই হয়ে কাজ কববে। ধিক্ ধিক্ এব চেয়ে আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ বিলুপ্ত হয়ে যাক্, এর চেয়ে যেখানে দুচোখ যায় চলে যাই, এব চেয়ে মৃত্যু ভাল।

মোহন—হ্যাঁ, এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। যে অক্ষম, জরাজীর্ণ, পঙ্গু সঙ্ঘ জাপানের করপুত্তলি হয়ে তার তর্জ্জনী হেলনে উঠা বসা করচে, তার বেঁচে থাকার কোন অধীকার নেই। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যদল তাকে অস্বীকার করবে। তার আদেশ তারা মানবে না।

রাঘবন্—দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার চিরকাল চলচে, দুর্ব্বলতা প্রবলদের অত্যাচার স্পৃহা প্রলুব্ধ করে। আমাদের সঙ্গে জাপান এতদিন ভাল ব্যবহার করেচে, কিন্তু আজ? আজ সে দুর্ব্বব্যবহার সুরু করেচে কেন? আমাদের দুর্ব্বল ভেবেই নয় কি? আমাদের যতটুকু দুর্ব্বলতা তাদের চোখে ধরা পড়বে ততটুকুই তাদের সাহসও বেড়ে যাবে। আজ এটা, কাল ওটা করে আমাদের পূরোপুরি গ্রাস করতে উদ্যত হবে।—কিক্ষানকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ দুর্ব্বল নয়। প্রয়োজন হলে সে বজ্র আঘাত করতে পারে। একদিকে আমেরিকা ও বৃটেন, অন্যদিকে চীনদেশ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে জাপানকে মৃত্যু আঘাত করবার জন্য উদ্যত হয়ে আছে। ভারতবর্ষ যদি তাদের সহায় হয় তবে জাপানের পতন অবশ্যম্ভাবী। ভারতের জাগ্রত জনমত পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটেনের যুদ্ধোদ্যম পঙ্গু করে দিয়েচে বলেই জাপান এত সহজে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েচে। ভারতের পুরোপূরী সহায়তা পেলে বৃটেন ও আমেরিকা জাপানকে মুষিকের মত পদদলিত করে যাবে। ভারতীয়গণের মিত্রতা আজ জাপানের জীবন মরণ সমস্যা, সে-কথা কিকানকে ভুলতে দেওয়া হবে না। কিকানের চোখের সামনে এই সত্যটি অহর্নিশি তুলে ধরতে হবে যে সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ায় ভারতীয়গণ ব্যাঙ্ককে সম্মিলিত হয়ে এই আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ গঠন করেচে।

জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, বোর্নীও, মাঞ্চুকুও, হংকং, বর্ম্মা, মালয়, সর্ব্বদেশ হতে ভারতীয়গণ জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল ভেদ্ বিবাদ ভুলে গিয়ে একত্র একযোগে এই সঙ্ঘ গড়ে তুলেচে। এই বিশাল সঙ্ঘকে ঘাঁটানো নিরাপদ নয়। এই সঙ্ঘের শতাধিক শাখা সমিতি পিনাঙ্, পেরেক, কেডা, সেলাঙ্গর, নেগ্রিসেম্বিলান, মালাক্ক, জোহর সর্ব্বত্র সর্ব্বষ্টেটে বিপুল উৎসাহে কাজ করে যাচ্ছে। ভারতীয় জনমত পূর্ব্বএশিয়া অঞ্চলে অচিরেই জাগ্রত হয়ে উঠবে। কিকানকে আমরা জিজ্ঞাসা করব সেই জাগ্রত জনমতের সে মৈত্রী চায় না শত্রুতা চায়। তাকে স্বপক্ষে পেতে চায় না বিপক্ষ করে তুলতে চায়।

রাসবিহারী—সবই বুঝি, কিন্তু উপায় কি? এত উত্তেজনা তো ভাল নয় রাঘবন্। মোহন সিং, জিলানি, তোমরা বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েচ। কাজ করতে হলে এত অধিক উত্তেজনা ভাল নয়। তোমরা শান্ত হও। সবদিক ভেবে চিন্তে, সবদিক বজায় রেখে কাজ করতে হবে। বার্লিনে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, আমাদের ও ঠিক তেম্নি করে পূর্ব্বএশিয়ায় কাজ করে যেতে হবে। ইউরোপের কাজ সম্পন্ন করে নেতাজী পূর্ব্বএশিয়ার কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করবেন। তাঁর হাতে কার্য্যভার তুলে দিয়ে তখন আমরা নিশ্চিন্ত হব। আজ তাঁর অবর্ত্তমানে সে জন্যই আমরা এমন কিছু করব না যাতে তাঁর সেদিনের কাজ বাধা প্রাপ্ত হয়। সিঙ্গাপুর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মেজর ফুজিওয়ারা যেদিন আমাদের ডেকে নিয়ে বললেন, "ইংরেজকে আমরা নিপাত করে এনেচি, ইংরেজের এখন মুমূর্ষ দশা। এই তোমাদের সময় এসেচে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার। এই সুযোগে আমাদের একযোগে শেষ স্বাধীনতা সমরের

আয়োজন কর।" তখন কি করব, কোন পথে যাব, কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। শতাব্দীব্যাপী তপস্যার ফলে, ব্যাকুল প্রার্থনায়, যদি বা একদিন স্বাধীনতা হাতের কাছে এল, তবু বুঝি হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করা হল না। হায়, হায়, সব বুঝি যায়! আমি এর মুখে চাইচি,—এ ওর মুখে চাইচে, ও তার মুখে চাইচে, কি ভাবে কি করতে হবে কেউ কিছু বলতে পারচে না। সারা জীবনের কঠোর পরিশ্রমে সঞ্চিত সর্ব্বস্বধন চোখের সামনে নষ্ট হয়ে বিকিয়ে যেতে দেখলে লোকে যেমন উন্মাদ হয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে, এই বৃদ্ধ বয়সে আমারও হল সেই দশা।—

এমন সময় বার্লিন থেকে বাংলার সিংহশিশু সুভাষচন্দ্র সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়া প্রকম্পিত করে গর্জ্জন করে উঠলেন, "স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব ভিক্ষা দেবে কে আছ ভারতবাসী? বুকের রক্ত দেবে কে আছ? আমি স্বাধীনতা এনে দেব, আমায় অনুসরণ কর।"—কি বলব মোহন সিং, কি বলব মেনন্, গভীর অন্ধকারে হঠাৎ যেন সেই বাণী ভাস্বর হয়ে উঠল। সেই আলোতে পথ চিনে নিতে এতটুকু দেরী হল না। সেই মুহূর্ত্তেই টোকিওর রেডিও থেকে জবাব দিলুম, "যাদের তুমি চেয়েচ নেতাজী, তারা সবাই সর্ব্বস্ব নিয়ে প্রস্তুত। তোমার পতাকাতলে তুমি তাদের আহ্বান করে নও।" তাঁরই নির্দ্দেশে ইত্তেহদ্, এতমদ্ ও কুরবাণীর মন্ত্র পূর্ব্বএশিয়ার দিকে দিকে প্রচারিত হল। এই অভিনব মন্ত্রে সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়া সাড়া দিয়ে উঠল। ইত্তেহদ্, এতমদ্ ও কুরবাণী মন্ত্রে ভারতীয়গণ দলে দলে আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের পতাকাতলে সমবেত হল। তারা ভুলে গেল সব দৈন্য হাহাকার, ভেসে গেল বন্যাস্রোতে ছোট ছোট গ্লানির যত আবর্জ্জনা। স্বাধীনতার জাহ্নবীধারায় নির্ম্মল হয়ে, পবিত্র হয়ে দেশমাতার

চরণতলে জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, সব বৈষম্য অঞ্জলি ভরে দিল আহুতি। ইত্তেহদ্, এতমদ্ ও কুরবাণীর মন্ত্রে নীপণের বন্দী ভারতীয় সেনা দলে দলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দিতে ছুটে এল। ভারতীয়গণ আর এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে রইল না, ভয়ে মুহ্যমান হয়ে জড়বৎ রইল না, তারা এক হল, সঙ্ঘবদ্ধ হল, বল সঞ্চয় করল। মোহন সিং, আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ অক্ষম নয়, জরাজীর্ণ নয়, পঙ্গু নয়। সকলকে এক করে একতার বলেই সে বলীয়ান্। নেতাজীর আদেশ ঐক্য, একতা চাই। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যদি সঙ্ঘের আদেশ না মানে তবে একতা থাকে না। একতা না থাকলে বলক্ষয় হবে, শক্ররা সুযোগ বুঝে নানাভাবে আক্রমন করবে, সেই আক্রমন প্রতিরোধের জন্য ততোধিক বলক্ষয় হবে। অনিবার্য্য বলক্ষয় আমাদের সকল আশা আকাঙ্খার মূলে অনিবার্য্য বেগেই কুঠারাঘাত করবে। সে-কথাটা ভেবে দেখ মোহন সিং। উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ কিছু করে ফেলো না।

মোহনসিং—একতা চাই। শক্তি চাই। কিন্তু ইত্তেহদ্ যেমন চাই এতমদ্ ও তেমি চাই। স্বাধীনতার জন্যই সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছি, জাপানের কাজ করে দেবার জন্য নয়। আজাদহিন্দ্ ফৌজ বিদেশীর হুকুম তামিল করবে?—আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগ দেবার আগে ইংরেজ সম্রাট ছিল প্রভু, আজ কি তার আসনে জাপানী সম্রাটকে বসাতে হবে? না, না, ও সব বুজরুকী চলবে না। নেতাজী চিরদিনের জন্য আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। আমাদের সত্যিকারের প্রভুকে আমরা চিনেছি। আমাদের দেশই আমাদের একমাত্র প্রভু। স্বাধীন ভারতই আমাদের হুকুম করবার অধিকার রাখে, আর কেউ নয়। ব্যাঙ্কের

বিরাট অধিবেশনে আমরা একবাক্যে দাবী করেছিলুম যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সৈন্যদল বলে মানতে হবে, জাপানী সৈন্যদলের সর্ব্বাংশে সমকক্ষ বলে স্বীকার করতে হবে। আমরা ঘোষণা করেছিলুম আজাদহিন্দ্ ফৌজ একমাত্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য ও সেই স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যই বিদেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর কোনো কাজে যোগ দিতে সে প্রস্তুত নয়। জাপান আজও আমাদের সে দাবী মেনে নেয়নি, আজও হ্যাঁ না, কিছুই বল্‌চে না, আজও প্রতিশ্রুত যুদ্ধাস্ত্রগুলি দিচ্ছে না, এমন কি সৈন্যদের ট্রেনিং দেবার পথেও বাধাই দিচ্ছে। জাপানের পূর্ব্বাপর কাজগুলো মিলিয়ে দেখ্‌লে আর সন্দেহ থাকে না যে ভারতে জাপানের আধিপত্য স্থাপনের জন্যই জাপান আমাদের ব্যবহার করতে চায়।

রাসবিহারী—সবই বুঝি মোহন সিং, কিন্তু উপায় কি? জাপান তার প্রতিশ্রুতি পালন করচে না সেজন্য নেতাজী ক্ষুব্ধ হবেন বটে, কিন্তু আমাদের দোষী করবেন না। তিনি জানেন যে জাপানের কার্য্যকলাপ আমাদের হাতের বাইরে, জাপানের কূটনীতি আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের আয়ত্বাধীন নয়। কিন্তু তিনি এসে যদি দেখতে পান যে ভারতীয়গণ একতা হারিয়েচে, তাদের ঐক্য নষ্ট হয়ে গেছে, তবে আর তাঁকে মুখ দেখাব কেমন করে? একতার জন্য দায়ী তো আমরা। তিনি যখন জানতে চাইবেন, জাপান যাই করুক, তোমাদের একতা ভাঙ্গলে কেন, তখন আমরা কি জবাব দেব? কর্ত্তব্য করিনি কেন, ইত্তেহদ্ থাকে নি কেন যখন জনে জনে জিজ্ঞাসা করবেন তখন তার জবাবদীহি কে করবে? ইত্তেহদ্ ও এতমদ্ ও কুরবাণীর মন্ত্রে পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয়গণ একদিন জেগে উঠেছিল। সর্ব্বাগ্রে ইত্তেহদ্,

একতার বাণী, আর তাকেই কিনা আমরা বিদেশীর পরে অভিমান করে চোখের সামনে বিলিয়ে দিচ্ছি!

আমরা একহতে পেরেছিলুম বলেই আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ গঠিত হল। নবীন অরুণোদয় হল আমাদের জীবনে। যদি এক না থাকি তবে যে তিমিরে ছিলুম সেই তিমিরেই আবার ফিরে যাব। যেমন অসহায় ছিলুম, দুর্ব্বল ছিলুম, তেমনি দুর্ব্বল অসহায় হব। যেমন পরপদানত ভিক্ষুক ছিলুম তাই থাকব। ভেবে দেখ মোহন সিং, চোখের উপর অভিমান করে মাটি পেতে ভাত খাওয়া আর কাকে বলে?

রাঘবন্—কিন্তু একতাই বা থাকচে কই? একতাটা যে রাখতে পারা যাচ্ছে না, সেটাই তো আরো দুর্ভাবনা। স্বরাজ প্রতিষ্ঠান নিয়ে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ নীপন সরকার দেখ্‌চে তাতে আর কি তারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে? ভারতীয় সঙ্ঘকে আর বাড়তে দেওয়া হবে না সেটা তারা ইতিমধ্যেই স্থির করেচে। কোথাথেকে একদল ভারতীয় যুবককে তারা সংগ্রহ করেচে, নানা উৎকোচ ও প্রলোভনে তাদের বশীভূত করেচে। এখন তাদের দিয়ে একটা পাল্টা সঙ্ঘ গড়েছে। এই ঝুটা সঙ্ঘ আমাদের ঐক্যের বাঁধন শিথিল করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেচে। মোহন সিং ও আমার পরেই তাদের বেশী আক্রোশ। আমাদের বিরুদ্ধে অশ্লীল কটুকাটব্য চল্‌চে, বর্ব্বরোচিত ব্যক্তিগত আক্রমন করচে। বোধ করি জাপানের ভারতলিপ্সার অঙ্গে আমরা কাঁটা হয়ে বিঁধচি বলেই আমরা তাদের দুটি চক্ষের বিষ হয়েচি। বোধকরি অনুরূপ ব্যাপার নিয়ে আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের কর্ম্মপরিষদ থেকে আমরাই সর্ব্বাগ্রে পদত্যাগ করেছিলুম বলে আমাদের দুজনের প্রতি তাদের এত ক্রোধ। আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ

থেকে লোক ভাগিয়ে নেবাব জন্য কত নির্জ্জলা মিথ্যা প্রচাবের আশ্রয়ই না ওবা নিচ্ছে। ওদেব প্রচারকার্য্য নীপন দপ্তবেব আনুকুল্যে শশাঙ্ককলার মতো দিন দিন বেড়ে চলেচে। ঘন ঘন সভা হচ্ছে। সভার বিজ্ঞপ্তি জাপানী সৈন্যরাই বিলি কবচে, স্থানে স্থানে সৈন্যবাই নোটিশ এঁটে দিচ্ছে। ভাবতেব এই ধুমকেতুদের আবির্ভাবে যারা পুলকিত হযে উঠে নি, ইয়াকুবো কিকান তাদের বক্তচক্ষু দেখাতে স্বরু করেচে। নীপনেব এই পকেট-সঙ্ঘ নীপনেব অর্থপুষ্ট মুষ্টিমেয় অর্ব্বাচীনেব দেশদ্রোহিতায জন্ম নিয়েচে বলেই কি তার ধ্বংশশক্তি কিছু কম? আমাদেব একতার মূলে গিয়েই তাবা আঘাত কবচে, আব তাবও মূলে রয়েচে জাপানের ভারত-লিপ্সা। সময় এসেচে জাপানেব সঙ্গে বোঝাপড়া কববাব। ইত্তেহদ্ ও এতমদেব জন্যই নীপনেব বিরুদ্ধে আমাদেব যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে।

বাসবিহাবী—সবই বুঝি রাঘবন্, কিন্তু উপায় কি ? একটু ধৈর্য্য ধব, সবই হবে। নীপনেব অর্থপুষ্টদল তাদের উদগাব তুলতে থাক, ওতে আমি ভীত নই। স্বাধীনতা অর্জ্জনেব জন্য যে বিপ্লবেব অগ্নি-শিখা জাগিয়ে তুলতে হয় তার মন্ত্র ওসব দেশ-দ্রোহীব কণ্ঠে ফোটে না। যে বিপ্লবের বিদ্যুচ্ছটা স্বাধীনতা স্বর্গের পথ নির্দ্দেশ করে, তাব সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে ওরা দাঁড়াতে পাবে না, ওদেব চোখ ধাধিয়ে যায়। নেতাজী যখন নিজে এসে দাঁড়াবেন, বিপ্লবের হোমানল শিখা স্বহস্তে প্রজ্জলিত করবেন, তখন ওদেব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। গরুড়ের ভয়ে ভীত অহিকুলেব মতই ওরা তখন গর্ত্তে যেতে পথ পাবে না। ইত্তেহদ, এতমদ্ ও কুরবাণীর মন্ত্র ভারতের বিপ্লব মন্ত্র। এই মন্ত্র নিয়ত উচ্চাবণ করে এতদিনে আমরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে পেরেচি। সময়

এসেচে বিপ্লবকে সক্রিয় করবার; অগ্নিগিরির বিস্ফোরণ হতে আর দেরী নেই। একটু ধৈর্য্য ধরে থাক।—

ব্যাঙ্কক অধিবেশনের পর এই কর্ম্মপরিষদ কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল মনে আছে তো? ভারতবর্ষে বিপ্লব সুরু না হওয়া পর্য্যন্ত আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না। আজ যখন গান্ধীজী "ভারত ছাড়ো" বাণী তুলে ধরেচেন তখন আর দেরী নেই, আমি বলচি ভারতের বুকে বিপ্লবাগ্নি জ্বলে উঠ্‌বে আর দেরী নেই। আমি বলচি, নেতাজী এসে পড়েচেন, আর দেরি নেই।

সকলে —[ব্যগ্রভাবে] নেতাজী আসচেন্? নেতাজী?—

রাসবিহারী—হ্যাঁ, তাঁর আসার সময় হল।

মেনন্ – জাপান যদি তাঁকে আস্‌তে না দেয়? যদি বাধা দেয়?

রাসবিহারী—নেতাজীকে আটকাবে জাপান? এই চিনলে তবে নেতাজীকে? তাঁর শক্তি পরীক্ষার আজও বাকি আছে? না, মেনন্, ব্রহ্মের বা ম'ই শুধু মান্দালয়ের কারাগার থেকে অন্তর্হিত হন নি, ভারতের নেতাজী তারও আগে কলকাতা থেকে তুড়ি মেরে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। এই আজাদ হিন্দ ফৌজ এশিয়ায় জন্মায় নি, ইউরোপে নেতাজীই তাকে জন্ম দিয়েছিলেন। সে জন্য ইংরাজ, জার্ম্মান, ইটালীয়ান, জাপান, পুলিশ, গেষ্টাপো, কূটনীতি, এমন কিছু নেই যার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে তাঁকে দাঁড়াতে হয় নি। এমন কিছু নেই, যার কাছে তাঁকে পরাজয় মানতে হয়েচে। যখন সময় হবে তখনই তিনি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়াবেন। কেউ বাধা দিতে পারবে না। তাঁর আসার সময় হয়েচে। আমরা যেন বলতে পারি আমরা প্রস্তুত।—

[পত্র হস্তে জাপানী সৈনিকের প্রবেশ ও মিলিটারি সেলাম করিয়া রাসবিহারীর হস্তে পত্রার্পন ও প্রস্থান। রাসবিহারী নিবিষ্টমনে পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হইল]

না, না, এ বড় অন্যায়। এ সব তো ভাল কথা নয়।

মোহন—কি হয়েচে ?

মেনন্—চিঠিতে কি আছে ? জাপান সরকারের চিঠি বলে মনে হচ্ছে ?

রাসবিহারী—হ্যাঁ, জাপান সরকারেরই চিঠি জাপান সরকাব দাবী করচেন যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। আমাদের ব্যাঙ্কক অধিবেশনের দাবীগুলি সম্বন্ধে তাঁরা বলচেন যে নেতাজীকে জাপানে আসতে দিতে এঁদের আপত্তি নেই। তিনি যদি আসেন তবে তাঁকেই নীপন সরকার তাঁদেব অভিপ্রায় জানাবেন। ততদিন ও সম্বন্ধে এঁরা কিছুই করতে প্রস্তুত নন।—নেতাজী না এলে যে কিছুই হবে না সে আমি বহুদিন থেকেই আন্দাজ করেচি। সে কথা থাক্। কিন্তু স্বরাজ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কেন পদত্যাগ করবে ? তোমরা যখন খুসী গায়ের জোরে তার ছাত্রদের ধরে নিয়ে উধাও হবে আর সে চুপচাপ বসে থাক্‌বে ? সে যদি সোরগোল করেই থাকে তবে তো উচিত কাজই করেচে, তার দোষটা কি ? না, না, ও সব তো ভাল কথা নয়।

মোহন—অসহ্য, অসহ্য, নীপনের স্পর্দ্ধা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ওরা আমাদের কি পেয়েচে ? আমাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা আমরাই যদি না রাখি তবে কে রাখবে ? আজাদহিন্দ সঙ্ঘ যদি তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে বিষবৃক্ষের মরণালিঙ্গন থেকে বাঁচাতে দ্বিধা করে তবে অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত থেকে কে তাকে রক্ষা করবে ?

স্বরাজ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কিছুতেই পদত্যাগ করবে না। না. ওসব চলবে না।

বাঘবন্—আলবৎ না! যখন তখন যা তা একটা আবদার ধরে বসলেই হল? জাপান কি ইয়ার্কি পেয়েচে নাকি? আমরা স্পষ্ট জবাব দেব যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ স্বকার্য্যেই বাহাল থাকবে। প্রতিষ্ঠানের মর্য্যদা রক্ষার জন্য নীপন সরকারের বিরক্তিভাজন হতে সে দ্বিধা করে নি, সেজন্য আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ তাকে পুরস্কৃতই করবে।

মেনন্—আমি ও না বলে পারলুম না. আমাদের দাবী যখন নেতাজী না এলে পূরণ হয় না, তখন স্বরাজ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকেই বা নেতাজীর আগমন পর্য্যন্ত কেন বাহাল রাখা চলে না? এটা যদি ততদিন মুলতুবী থাকতে পারে তবে ওটাও কেন ততদিন মুলতুবী থাকবে না?

রাসবিহারী—সবই বুঝি, কিন্তু উপায় কি? মেনন্ তুমি ও শেষে ঐ সুরই ধরলে? আমি একলা আর কতদিক সামলাই বল?—নেতাজী আসচেন, এই কি সময় নীপনের সঙ্গে কলহ করবার? নেতাজী এসে না দাঁড়ালে যে কলহই আমরা সুরু করি না কেন তাই যে শেষ পর্য্যন্ত আত্মকলহে পরিণত হবে সে কথাটা আমি কি করে বোঝাব!—যাক্ সে কথা। ধরে নাও জাপান আমাদের নানা স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে আমাদের দিয়ে তার নিজের কাজ করিয়ে নিতে চায়, ভারতবর্ষ করায়ত্ব করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতবর্ষ এখনই, কি স্বাধীন? ভারতের বর্ত্তমানটা কি? তার ভবিষ্যত নিয়ে আমরা যে সজোরে মাথা ঘামাচ্ছি, তার বর্ত্তমানটা কি তবে ভুলে যেতে হবে? ভারত আজ বৃটিশ সাম্রাজ্য। ভারতের স্বাধীনতার আজ প্রধান অন্তরায় ইংরেজ। বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং

না হলে ভারত স্বাধীন হবে কি করে ?—জাপানের সঙ্গে বোঝা পড়া নেতাজীই করবেন। সময় যখন হবে তখন আজাদহিন্দ্ সঙ্ঘই সর্ব্বাগ্রে সেই বোঝাপড়ার কাজে নেতাজীর পাশে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য আজও ধ্বংস হয় নি। আজ তো আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে নীপনের উদ্যত মুষ্টি শিথিল হয়ে যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্য নীপন অগ্রসর হয়েছে, পূর্ব্ব এশিয়ার সাম্রাজ্য খণ্ডগুলি একটির পর একটি আজ দ্রুতবেগে নীপনের করায়ত্ব হচ্ছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন করবার জন্য সেই সঙ্গে আমরাও প্রস্তুত হচ্ছি নীপনও আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েচে। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্, কাঁটাদিয়েই কাঁটা তুলে ফেলতে হয়। জাপান যতদিন ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত না পৌছয় ততদিন তার সঙ্গে আমাদের কি নিয়ে লড়াই ? কিসের লড়াই ? ততদিন জাপান সেই কণ্টক যে কণ্টকদিয়ে ভারতের তীক্ষ্ণ কণ্টকটিকে তুলে ফেলতে হবে। বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে জাপান যে আজ আমাদের প্রধান সহায় সে কথা কি তোমরা অস্বীকার করবে ? জাপান আমাদের অবমাননা করেচে, অবজ্ঞা করেচে, মানি সে কথা। কিন্তু মালয় ও ব্রহ্মের কথাই কি ভারতবাসী ভুলতে পারবে ? বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীকগুলো যখন শুধু উদ্ধত অশিষ্ট আচরণই নয়, উত্তর মালয়ের ভারতীয় শ্রমিকদের গুলি করে মারলে। তোমাদের অর্থে যখন রেঙ্গুনের ইংরেজ গভর্ণর ত্রিশ হাজার টাকার সেলটার নিজের জন্য তৈরী করালে আর তোমাদের দিলে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে জাপানের বোমা বুক পেতে নিতে। জাপানী বোমারুর দ্বিতীয় আক্রমণেই যখন বৃটিশ সরকার তল্পীতল্পা নিয়ে ছুট দিল। রেঙ্গুনের কারাগার, পাগলা

গারদ, কুষ্ঠ গারদ খোলা পড়ে রইল। তোমরা অনাথের দল চোর ডাকাত, খুনে বদমাসদের শিকার হয়ে পড়ে রইলে। পাগল ও কুষ্ঠীগুলোকে ঠেকাতে না পেরে ভয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলে। অবাধ লুট তরাজ চলল, অগ্নিকাণ্ড চলল, আর শ্বেতাঙ্গগুলো তোমাদের কথা এতটুকু না ভেবে নিজ নিজ প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। সেদিনের সে সব কথা কি এতোই পুরোণো হয়ে গেছে? পুরোণো হয়ে গেছে কি পিনাঙ এর কথা যখন জাপানী বোমারুর আক্রমণে তোমাদের ঘর বাড়ী বিধ্বস্ত হল। পুলিসের পলায়নে গুণ্ডার দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, অবশিষ্ট ঘরবাড়ী লুটতরাজ করল, আগুন ধরিয়ে দিল। ফায়ার ব্রিগেড্ অন্তর্দ্ধান হয়েছিল বলে চোখের উপর একটি একটি করে তোমাদের সর্ব্বস্ব জলে জলে ভস্মস্তুপ হল। মৃতদেহ ও পচা শবের পথে ছড়াছড়ি। পালিয়া কুকুর, বন্য শৃগাল, এমন কি ইঁদুরগুলো পর্য্যন্ত সেই শব পথে পথে গ্রাস করতে লাগল। দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে গেল। তোমরা ক্ষিধেয় ছুটোছুটি করতে লাগলে। স্তূপীকৃত নোঙরা আবর্জ্জনার মধ্যে বসে তোমরা হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তিরোহিত হয়েচে। তোমরা দেখলে যে সাদাচামড়ার দল প্রাণভয়ে এক কোণে কামান বন্দুক ও বিভলবারগুলো জড় করে তার আড়ালে সরে গেছে। খাদ্যবস্তু সব হস্তগত করে নিয়ে সেই কোণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েচে। তাদের সে—গর্ত্তে তোমাদের কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না।—কত বলব, যখনই ইভাকুয়েশানের সিদ্ধান্ত হয়েচে তখনই স্থানীয় সিভিল ও মিলিটারি শ্বেতাঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেচে যে একমাত্র বিশুদ্ধ বৃটিশ রক্ত যার দেহে আছে সেই ইভাকুয়েট করবার অধিকারী। মিসেস্ বি—একজন ইউরেশিয়ান,

মিঃ বি—তাকে ফেলেই চম্পট্ দিলেন, মিসেস্ বি—সেখানেই পড়ে রইলেন। এশিয়াবাসী ইভাকুয়েট করবার অধিকারী নয় ঘোষনা হয়ে গেল, ব্যস্ আর কি চাও? সব ল্যাঠাই তো চুকে গেল। দুই শতাব্দী এই ব্যবহার পেয়ে পেয়ে ওসব এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে বুঝি? জালিয়ানওয়ালা বাগ ভুলে গেছ? ভুলে গেছ যে এই মুহূর্ত্তে গান্ধীজী কার কারাগারে? ভুলে গেছ তোমাদের কে করেছে কুলী ও কেরানীর জাত? বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীকগুলি আমাদের প্রতি যে চূড়ান্ত বর্ব্বরতা করেচে। নীপণ কি তার শতাংশের একাংশও করচে? নীপন আমাদের প্রধান শত্রু নয়, এমন কি নীপন আজ আমাদের প্রধান সহায়। স্বরাজ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পদত্যাগ করলেই যদি নীপন সন্তুষ্ট হয় তবে তাই হোক। আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘকে রক্ষা করবার জন্য না হয় সেটাই প্রথম কুরবানী হোক্।—

[কিকানদপ্তরের জরুরী চিঠি লইয়া জাপানী সৈনিকের প্রবেশ। রাসবিহারীর হস্তে পত্র প্রদান ও মিলিটারি সেলাম করিয়া প্রস্থান।]

কিকান দপ্তরের জরুরী চিঠি।

মেনন্ — কি লিখেচে?

রাসবিহারী—লিখেচে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের একটি বেটেলিয়ানকে অবিলম্বে বার্ম্মায় পাঠাতে হবে। সেখানে জাপানী সেনাপতির অধীনে এদের যুদ্ধ করতে হবে। সৈন্যবাহী জাপানী জাহাজ এদের নেবার জন্য সিয়োনানে এসে পৌঁছেচে, আর দেরী করলে চলবে না। কিছুদিন আগে কিকান যখন আমাদের কাছে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছিল, আমরা নাকি তখন নানা ওজর আপত্তি করে সৈন্য প্রেরণ করি নি। শুন্য

জাহাজ ফিরে গিয়েছিল বলে ওদের বিস্তর ক্ষতি হয়েচে। চট্টগ্রাম ও বঙ্গদেশে জাপান একটা বড় রকমের আক্রমণ চালাবার আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছিল, আমাদের সৈন্য পায়নি বলে সেটা ভেঙ্গে গেছে। এখন ওরা আর কোনো কথাই শুনবে না। এক বেটেলিয়ান পাঠাতেই হবে এবং এখনই।

মোহন —কখনও না!

জিলানি—কিছুতেই না!

রাঘবন্—এতদূর স্পর্দ্ধা কিকানের?

মেনন্—তার চেয়ে আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ ভেঙে চুরমার করে দেখ, পেয়েচে কি?

রাসবিহারী—সবই বুঝি, কিন্তু—

সকলে—[রাসবিহারীকে অনুকরণ করিয়া] কিন্তু উপায় কি!

রাঘবন্—সবই যখন বুঝি তখন উপায়ও আছে। জাপানী মর্কটের দুটি গালে কষে দুটি চড় লাগান।

মোহন —আজাদ হিন্দ্ ফৌজ হুকুম নেবে জাপানী কমাণ্ডারের কাছে! তার আগে জাপানী সেনাপতির মুখে ওরা লাথি মারবে।

মেনন্—একতাই যদি চান তবে জাপানের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াই আসুন। আজ জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে যদি সেটা মারাত্মক ভুলও হয় তবু আসুন আমরা একসঙ্গে একযোগে সেই মারাত্মক ভুলই করি। নীপনের শয়তানী আমাদের একতার বাঁধ ভেঙে না দিয়ে তাকে শক্তই করুক, দৃঢ়তরই করুক।

রাসবিহারী—আর তো পারিনে নেতাজী, আর বুঝি সামলাতে পারলুম না। বাইরের আগুন এবার ভিতরে ছড়িয়ে পড়ল। এতদিন ধরে যা কিছু হল সব বুঝি যায়। বৃদ্ধকে এবার এই গুরুভার থেকে মুক্তি দাও নেতাজী, শীঘ্র এস, আমি আর পারিনে।

[বাহিরে বাদ্যোদ্যম ও নেতাজী কি জয় ধ্বনি।
দৌড়িয়া বার্তাবহের প্রবেশ।]

বার্তাবহ—নেতাজী এসেচেন। জার্মান সাবমেরিণে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে, জাপানী সাবমেরিণে সুমাত্রা এসে পৌছেচেন। কাল জাপানী বিমানে টোকিও পৌছুবেন। বার্লিন থেকে তিনমাস আগে রওয়ানা হয়ে, শত্রুর সব আক্রমণ ব্যর্থ করে কিছু আগে সুমাত্রা এসে পৌছেচেন।

রাসবিহারী—এসেচ নেতাজী! আঃ বাঁচলুম! আর ভয় নেই। এবার তোমার কাজ তুমি নিজের হাতে তুলে নাও। বৃদ্ধকে এবার ছুটি দাও। আর যে পারিনে।—

সকলে—নেতাজী কি জয়!

[একদল নরনারী ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হস্তে প্রবেশ করিল ও বাদ্যের সঙ্গে গাহিয়া চলিল—জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা। সকলে সেই গানে যোগ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া নির্গত হইলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[টোকিও। সুভাষচন্দ্র ও আজাদহিন্দ্ সঙ্ঘের কর্ম্মপরিষদ।]

মেনন — আমরা এখন কি করব নেতাজী? কি করা আমাদের কর্ত্তব্য?

সুভাষ — জাপানের সঙ্গে লড়তে হবে। কিন্তু হাতিয়ার দিয়ে নয়, অন্য উপায়ে। সামনে পিছনে প্রবল শত্রু রেখে যুদ্ধ করা রণকৌশল নয়।

মেনন্ ও জিলানি—হ্যাঁ, ঠিক।

রাসবিহারী—জাপানের সঙ্গে কি করে লড়াই করবেন, কি উপায়ে।

সুভাষ — [মৃদু হাসিয়া] বার্লিনে যে উপায়ে জার্ম্মানী ও ইটালীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলুম সেটা আবার স্মরণ করে ফেলব !—
তখন ছিলুম নিরস্ত্র, একাকী। এখন তো আর নিরস্ত্র নই, একাকীও নই !

রাসবিহারী—হ্যাঁ ঠিক।

সুভাষ — অর্থ সংগ্রহ হচ্ছে?

রাসবিহারী—হাঁ।

সুভাষ — কত হয়েচে?

রাসবিহারী—বিশলক্ষ ডলার হবে।

সুভাষ — হুঁ !—কিন্তু যে শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব সে যুদ্ধের জন্যই প্রতিদিন বিশকোটি টাকা ব্যয় করচে।

রাসবিহারী—জাপানের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত হয় না যাতে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়?

সুভাষ — তা হয় না। অর্থের জন্য আমরা জাপানের দ্বারস্থ হব না, কারো দ্বারস্থ হব না। হাত পাতলেই ওরা আজাদহিন্দ্ সঙ্ঘের কাজে

হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ পাবে। অর্থহীনতার চেয়ে সেটা বেশী মারাত্মক হবে।

রাসবিহারী—[নতমুখে] তবে উপায় কি ?

সুভাষ — পূর্ব্ব এশিয়ার যেখানে যে ভারতবাসী আছে তার কাছে ভিক্ষা-পাত্র নিয়ে যাব, ডেকে বলব, তোমরা অর্থ দাও, যার যা আছে দাও, তোমাদের যথা সর্ব্বস্ব দাও। সৈনিকদের মুখে আহার দিতে হবে, পরবার বস্ত্র দিতে হবে, যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। যান বাহন চাই, বিমান চাই, অর্থ দাও। মুক্তি ফৌজের আহত সেনানীর চিকিৎসার জন্য, ঔষধপত্রের জন্য, সেবা শুশ্রূষার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন, অর্থ দাও। কুরবাণীর মন্ত্রে যারা দীক্ষিত হয়েছে তারাই আজ তা উদ্‌যাপন কর, যারা দীক্ষা গ্রহণ করনি আজ তারা দীক্ষিত হও। নইলে মুক্তি ফৌজ লড়বে কি করে, লড়বে কি নিয়ে ? যার যা আছে এনে দাও। যতবড় কুরবাণী ততবড় সাফল্য এই কথাটি জনে জনে বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই আমাদের প্রথম কাজ।

মেনন — মনে হচ্ছে যেন এমনি সবল একটা আহ্বানের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছিলুম। তাই হবে নেতাজী। আজাদহিন্দ্ সঙ্ঘ কাল বিলম্ব না করে এই আহ্বান পূর্ব্ব এশিয়ার দিকে দিকে প্রচারিত করবে। নেতাজীর আগমন প্রতীক্ষায় দিকে দিকে সব প্রস্তুত হয়ে থাকবে। অর্থ সংগ্রহের প্রতিযোগীতা চলবে। নেতাজীকে শুধু দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক অর্থ নিয়ে আসবে।

সুভাষ — বল কি মেনন ?

জিলানি —আপনি জানেন না নেতাজী। আপনার জন্য আজ পূর্ব্বএশিয়ার লক্ষ লোক প্রাণ দিতে পারে। নেতাজীর বাণীতে যারা জেগেচে নেতাজী তাদের কত আপনার জন। টৌকিওতে পদার্পন করেই

কি তা অনুভব করেননি? যে স্বতস্ফূর্ত বিপুল সম্বর্দ্ধনা টোকিওতে এসেই পেয়েছিলেন, জাপান সম্রাটও কখন জাপানীদের কাছে তেমনটি পাননি।

সুভাষ — তবে আর ভাবনা কি জিলানি? সব হবে, আমি অসাধ্য সাধন করব। কাজে অগ্রসর হও।—ইনক্লাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ, জয়হিন্দ্।

সকলে — ইনক্লাব জিন্দাবাদ, আজাদহিন্দ জিন্দাবাদ, জয়হিন্দ।

তৃতীয় দৃশ্য।

[টোকিও। জাপানের প্রিমিয়ার জেনেরেল টোজোর খাস্ কামরা।
জেনেরেল টোজো, জাপানের সচিবগণ ও জেনেরেল ওসিমা।]

ওসিমা— খুব হুঁসিয়ার। সুভাষ বোস্ সহজ পাত্র নয়। তার চোখে ধুলো দেওয়া কঠিন। লোকটা অত্যন্ত চতুর। খুব সতর্ক হয়ে কথাবার্ত্তা বলতে হবে। তাকে যদি একবার হাতের মুঠোয় পাই তবে ভারতবর্ষ আর বেহাত হবে না।—
আবার বলি হুঁসিয়ার! বেফাঁস কথাবার্ত্তা ওর সাম্নে কোনমতেই চলবে না। ঐযে সুভাষ বোস আস্চে।

[সুভাসের প্রবেশ ও জয়হিন্দ্ বলিয়া অভিবাদন। জাপানের বিখ্যাত অতিবিনয়ী প্রথায় সুভাষকে সকলের শিষ্ট সম্ভাষণ ও অভিবাদন।]

টোজো —আসুন, আসুন, ইওর একসেলেন্সী, আসুন সুভাষবাবু। জাপান আপনার স্বগৃহ। যা কিছু দেখচেন সবই আপনার, আমরাও আপনারই লোক। হে, হে, হে! আপনার সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে অনুরোধ করচি আসন গ্রহণ করবার ক্লেশটুকু স্বীকার করুন। হে, হে, হে, আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েচি। আপনার টোকিও বাস যদি বিন্দুমাত্র অসুবিধায় কলঙ্কিত হয় তবে আমরা মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাব।

সুভাষ —আপনাদের ভুবনবিদিত সৌজন্য ও শিষ্টাচারে কে না মুগ্ধ হয় জেনেরেল টোজো? আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন— যদি অনুমতি করেন তবে এবার আমার প্রার্থনা জানাই।

টোজো —বিলক্ষণ! আমাদের আপনি হুকুম করুন সুভাষবাবু। যথাসাধ্য আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করব। আমরা জানি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আপনার একমাত্র লক্ষ্য। আমাদের লক্ষ্যও তাই। আপনার অনুমতি-পেলে আমরা একযোগে এই কাজে অবতীর্ণ হতে পারি।

সুভাষ —আপনাদের আন্তরিক সহায়তা পেলে ভারতবর্ষ একদিনেই স্বাধীন হতে পারে জেনেরেল টোজো।

টোজো —আপনার সহযোগিতা ভিক্ষা চাই সুভাষ বাবু। আর কিছু আমরা চাই না।

সুভাষ — স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসী প্রাণ দিতে পাবে, আর সহযোগিতা করবে না?

টোজো— শুনে কৃতার্থ হলাম সুভাষবাবু। আপনার আন্তরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হলাম।

সুভাষ — ভারতের এই দুর্দ্দিনে যারা অযাচিত ভাবে তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, ভারতবর্ষ সেই সহৃদয় জাতিকে কি দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাবে জেনেরেল টোজো?

টোজো —কৃতজ্ঞতা? না, না, আমাদের কাজে আপনাকে সহায় পেয়ে আমরাই ববঞ্চ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। বৃহত্তর পূর্ব্বএশিয়া থেকে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের সমূলে উচ্ছেদ করা একান্ত প্রয়োজন। ওরাই পূর্ব্বএশিয়ার দুঃখদুর্দ্দশার মূল। আমাদের বুকে চেপে বসে ওরা ভ্যাম্পায়ারের মত আমাদের রক্ত শোষণ করচে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড পূর্ব্বএশিয়ার সুখশান্তি, অর্থসমৃদ্ধি যথাসর্ব্বস্ব হরণ করচে। ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড কে অমিততেজা নীপন সম্রাট ইতিমধ্যেই নিপাত করেচেন, বাকি শুধু ইংলণ্ড ও আমেরিকা। ভারতবর্ষেই দেখুন না,

ইংরেজগুলো কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেচে, আর নড়ানো যাচ্ছে না। ফলে ভারতবর্ষের মত সমৃদ্ধ দেশ আজ অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, শিক্ষার অভাবে, সুযোগের অভাবে উৎসন্ন হয়ে যাচ্ছে। ভারতের প্রতিবেশী চীন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের হাতে পড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। ওরাও যাবে না, চীনের দুর্গতির ও শেষ হবে না। এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ এত বিচিত্র ও প্রচুর যে একদেশ অন্যদেশের সঙ্গে স্বেচ্ছায় সম্পদ বিনিময় করলে উভয় দেশই লাভবান হয়, পরস্পরের সহযোগিতায় উভয়েই সমৃদ্ধতর হতে পারে। সেই সমৃদ্ধির কল্পনাও শ্বেতকায় সাম্রাজ্যলিপ্সুদের চক্ষুশূল। বৃহত্তর পূর্ব্বএশিয়া যদি সত্যসত্যই কখনো কো-প্রস্পারিটির এলাকা হয়ে গড়ে উঠে তবে সাদা-চামড়াদের চিরতরেই পটল তুলতে হবে। সেজন্য, আমরা কো-প্রসপারিটির বাণী পূর্ব্বএশিয়ার সামনে তুলে ধরচি বলে, আমাদের নামে কত কুৎসাই না ওরা রটাচ্ছে, কত অলীক কথাই না প্রচার করচে! চিয়াং কাইশেক্ ওদের কথায় বিশ্বাস করে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েচে। ভারতবর্ষ আশা করি সে ভুল করবে না।

সুভাষ — স্বাধীন ভারতবর্ষ কারো কথায় ভুলবে না, জেনেরেল টোজো, ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য যা প্রয়োজন তাই সে করবে।— ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া এখন আমরা অন্য কিছুই ভাবি না, ভাববার অবকাশ নেই। ভারতের ভিতরে কিম্বা বাইরে কখনও যে যুদ্ধাস্ত্র ভারতবাসীর হাতে আসতে পারে, এই মহাযুদ্ধের আগে তা আমরা স্বপ্নেও আশা করি নি। আজ যখন তা সম্ভব হয়েচে তখন ভারতশত্রুর তরবারি ভারতের অভ্যন্তর নিরস্ত্র বিদ্রোহ যতই দমন করুক, ভারতের বাইরে থেকে

বিপ্লব তাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করবে। দুই শতাব্দীর হীন মিথ্যাচারে ভারত আজ মরিয়া হয়ে উঠেচে। দুই শতাব্দী ব্যাপী শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলে ভারত আজ অনশন ও মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েচে। ভারতে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীর সম্পূর্ণ অপাংক্তেয় হয়ে কোনমতে টিঁকে আছে। শুধু একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা, একটি অগ্নিশিখা আজ দাবানল জ্বালতে পারে। ভারতের বাইরে, ভারতের ভিতরে ভারতের চতুর্দ্দিকে সেই দাবানল এক নিমেষে ছড়িয়ে পড়বে। একটি অনির্ব্বাণ মহতী শিখায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত সে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আসুন সে অগ্নি জাগিয়ে তুলি। আপনাদের সহায়তায় তা সম্ভব হবে। সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন তাকে হাতছাড়া করা মূঢ়তা। অন্য কিছু ভাববার দিন আজ নয়, আজ সময় থাকতে কাজে নামতে হবে।

টোজো —একেবারে আমাদের মনের কথাটা টেনে নিয়ে বলেচেন সুভাষ বাবু। আমাদের কথাও ঠিক তাই। আমাদের ক্ষীণ মস্তিষ্কে কথাটা যখন ভেবে ফেলতে পেরেচি তখন হেঁ, হেঁ, হেঁ আপনার মত একজন অশেষ বুদ্ধি সম্পন্ন নেতা যে সহজেই সেটা ভেবেচেন তার আর আশ্চর্য্য কি? ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য এখন শুধু একটি জিনিষের প্রয়োজন। একটি আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী। তার আয়োজনও আমরা করে ফেলেচি। নীপনের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল ভারতযুদ্ধের জন্য এখন থেকেই বিশেষ শিক্ষায় নিযুক্ত আছে। ভারতীয় রীতিনীতিতে তাদের শিক্ষিত করবার ব্যবস্থাও হয়েচে। আপনার সহায়তা পেলে এই সৈন্যদল অচিরেই ভারতবর্ষ থেকে শত্রুসৈন্য নির্ম্মূল

করে দেবে। এরা আপনাদেরই সৈন্যদল সুভাষবাবু, এরাই ভারতের মুক্তিফৌজ।—

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নেতৃত্ব করেছিলেন গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন। পূর্ব্ব এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধে বিধাতার বরে নেতৃত্ব করচেন নীপন সম্রাট। অমিত বলশালী, অদ্বিতীয় রণকৌশলী নীপন সম্রাট সবার হয়ে রণে অগ্রসর হয়েচেন। সম্রাটের আদেশে তাঁর ভুবনজয়ী বিরাট বাহিনী দেখতে দেখতে ফিলিপাইনস্, মালয়, ইন্দোচীন থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ থেকে শত্রু বিতাড়ণ করেচে। ফিলিপাইনস্ আজ স্বাধীন, মালয় আজ স্বাধীন, ইন্দোচীন আজ স্বাধীন। ব্রহ্মদেশের আদিপতি বা ম স্বাধীন ব্রহ্মের শাসনদণ্ড পরিচালনা করচেন। চীনদেশে ওয়ান্ চিং ওয়ে স্বাধীন নান্‌কিং গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করেচেন। মাঞ্চুকুও, থাইলেণ্ড শ্বেতাঙ্গদের কবলমুক্ত হয়ে আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন। জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও আজ আর শ্বেতাঙ্গদের সাম্রাজ্য নয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন বৃহত্তর পূর্ব্বএশিয়া দ্রুতবেগে গড়ে উঠ্‌চে। স্বাধীনতার জয়ধ্বজা অপ্রতিদ্বন্দ্বী নীপন সম্রাটের রণকৌশলে সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশে উড্ডীন হয়েচে। ভারতও অচিরেই স্বাধীন হবে। বৃহত্তর এশিয়ার এই মুক্তিফৌজ ভারতবর্ষকে অনতিবিলম্বে ইংরেজের গ্রাস থেকে মুক্ত করবে, সুভাষবাবু, এরা আপনাদেরই মুক্তি ফৌজ।

সুভাষ — তবে আর ভাবনা কি জেনেরেল টোজো ? কিন্তু নীপন সৈন্যের মাথায় আমাদের সব বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আমরা সরে দাঁড়াব, তাও কি হয় ? এতটুকু কাজের ভাগ নেব না, ভারতবর্ষ এত অকৃতজ্ঞ নয়। গুয়াম্, ওয়েক্, ফিলিপাইন্‌স্, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও সর্ব্বত্র এখন জাপানী সৈন্য মোতায়েন রাখতে হচ্ছে। চীনে, মাঞ্চুকুও সীমান্ত, মালয়, বার্ম্মা, ইন্দোচীন

থাইলেণ্ডে জাপানের বিরাট বাহিনী রণক্ষেত্রে ব্যাপৃত আছে। আমেরিকা আক্রমণের জন্য বিপুল নীপন বাহিনী হাতে রাখতে হচ্ছে। এই কি সময় এই পর্ব্বত প্রমাণ দায়িত্বভারগ্রস্ত নীপন সেনার স্কন্ধে গোটা ভারতস্বাধীনতা যুদ্ধটা চাপিয়ে দেবার ? না, না, আমরা অমানুষ নই জেনেরেল টোজো। নীপনের শ্রমলাঘব করা আমাদেরই কাজ, ওটা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

টোজো—পরম আপ্যায়িত হলাম সুভাষবাবু। কিন্তু তার কিছুমাত্র প্রয়োজন হবে না দেখবেন। কথাটা কি জানেন ? অর্ব্বাচীন ইংরেজগুলো দুই শতাব্দী ধরে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তই নানাভাবে সুরক্ষিত করেচে। ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে কখনও যে কোনো প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের মৃত্যুরণে আহ্বান করবে সেটা তারা মোটেই ভাবতে পারে নি। সেজন্য পূর্ব্ব দিক দিয়ে ভারত আক্রমণ খুব সোজা হয়ে গেছে। ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার একমাত্র ব্যবস্থা ওরা করেচে সিঙ্গাপুরের নৌদুর্গ নির্ম্মাণ করে। আর কোনো ব্যবস্থাই নেই। বিশ বৎসর লেগেচে এই সিঙ্গাপুরের দুর্গ তৈরী করতে। দীর্ঘ বিশবৎসর ধরে যা গড়ে উঠ্‌ল, জেনেরেল ইয়ামাসিটা তাই কি না এক সপ্তাহে অধিকার করে বস্‌ল। হা, হা, হা,! আর আজ ওয়াভেল কিসের আশায় উন্মত্ত বেগে মণিপুরে, আরাকাণে দুর্গের পর দুর্গ তৈরী করিয়ে যাচ্ছে! সে কি ভাবে এই কদিনের গড়া খেলা-ঘরগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে নীপন সেনার চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও লাগবে ?

সুভাষ—চমৎকার, জেনেরেল টোজো, চমৎকার! দিগ্বিজয়ী নীপন সম্রাট যেমন সহৃদয় তেম্নি কার্য্য কুশল ও "বুদ্ধিমান্"। বেচারা ইংরেজ জানে না কার তীক্ষ্ণ অসি তার সাম্রাজ্যের উপর উদ্যত

হয়েচে। পূর্ব্বদিগন্ত থেকে হঠাৎ একটা বাজপাখী—নেবে এসে ছোঁ মেরে ভারত সাম্রাজ্য তার হাত থেকে কেড়ে নেবে সে-কথা সে কল্পনাও করতে পারে নি। এত উদ্যোগ আয়োজন তার সব বৃথা হয়ে গেল। তা, যে কথা হচ্ছিল, আমার তবে এখন আর কিছুই করবার নেই ?

টোজো —না, না, এমন কথা বলবেন না। এ সবই তো আপনি করচেন। আমরা শুধু আপনার অভিপ্রায় জেনে হাত চালিয়ে কাজটুকু সম্পাদন করে দিচ্ছি মাত্র। আমরা কি আপনার থেকে ভিন্ন! হ্যাঁ, তা, ও বলি, একান্তই যদি আপনি কুণ্ঠা বোধ করেন তবে ভারতীয় প্রচারকার্য্য না হয় আপনি নিজেই করুন। হে, হে হে, আপনার মত মহদাশয় ব্যক্তির মনে এতটুকু গ্লানি থেকে গেলে আমরা নিতান্ত মর্ম্মাহত হব।

সুভাষ — বড় কৃতজ্ঞ হলাম জেনেরেল টোজো। তবু তো মনকে সান্ত্বনা দিতে পারব যে আপনাদের কোনো একটা কাজে লাগলুম। তা, ইংরেজ শীঘ্রই ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হচ্ছে ?

টোজো —হ্যাঁ, সুভাষবাবু, দুর্দ্ধর্ষ নীপন সৈন্যের বাহুবলে দেখতে দেখতে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে, আর দেরি নেই।

সুভাষ — কি আনন্দ, কি অভূতপূর্ব্ব আশার বাণী! ভারতের কোটি কোটি নরনারী দুটি হাত তুলে আপনাদের আশীর্ব্বাদ করবে, আপনাদের জয় জয়কার হোক্। তা হলে আর তো দেরি করা চলে না। ভারত যখন অচিরেই স্বাধীন হবে তখন স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্ট এই বেলা করে ফেলতে হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থলে যাতে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট শাসনকার্য্য হাতে তুলে নিতে পারে তার ব্যবস্থাটা এখন থেকেই দেখতে হয়।—

[টোজো চম্‌কাইয়া উঠিলেন। ওসিমা দুই হাতের তেলো তুলিয়া হতাশার ভাব দেখাইলেন।]

টোজো —তাব এত তাড়াতাড়ি কি সুভাষবাবু? সে এক সময় করলেই হবে।

সুভাষ — বলেন কি? এই যে বললেন আর দেরী নেই? ভারত অচিরেই স্বাধীন হবে? এখন কি বিলম্বের সময়? না, না, আমি কোনো কথা শুন্‌ব না, স্বাধীনভারত গভর্ণমেণ্ট এখনই করতে হবে। সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশে স্বাধীনতার প্রথম আভাসেই স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট গড়ে উঠেচে। বর্ত্তমান যুগেও আইরলেণ্ডের অধিবাসীরা তাই করেচে, ১৯১৬ সালেই তারা স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেছিল। চেক্‌রাও তাই করেচে, গত মহাযুদ্ধের মধ্যেই তারা স্বাধীন চেক্ গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেছিল। মুস্তাফা কামাল পাশার নির্দ্দেশে তুরস্কবাসীরা এনেটোলিয়ায় তাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেছিল। আজ ও লণ্ডনে স্বাধীন ফ্রেঞ্চ্ গভর্ণমেণ্ট রয়েচে। স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট স্থাপনই তো এখন আমাদের সর্ব্ব প্রধান কাজ। —আমরা কি একটা অরাজক বিশৃঙ্খল দেশে কাড়াকাড়ি মারামারি করতে করতে আপনাদের কঠোর তপস্যালব্ধ কোপ্রস্‌-পারিটির বাণী শ্রবণ করব? পূর্ব্ব এশিয়ার কোপ্রস্‌পারিটির বাণী অমর্য্যাদা পাবে, সেকি হয়? যাঁদের কাছে আমরা এত কৃতজ্ঞ তাঁদের অভ্যর্থনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা কি আমাদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য নয়?

টোজো —নিশ্চয়, নিশ্চয়, কিন্তু বলছিলুম কি, এত তাড়াতাড়ি—আমাদের একটু ভাববার অবকাশ না দিয়ে—জাপানের সঙ্গে একটা সর্ত্ত টর্ত্ত হলো না—এই নূতন গভর্ণমেণ্ট হয়ে যাবে—সেটা—

সুভাষ — [দৃঢ়কণ্ঠে] ভারতের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট না হলে সর্ত্ত হবে কার সঙ্গে ? সর্ত্তে আবদ্ধ করবেনই বা কাকে ? আগে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট হোক, তারপর জাপানের সঙ্গে চুক্তি তো হবেই।

টোজো.—আমাদের একটু সময় দিতে হবে সুভাষবাবু, কথাটা আমরা একটু ভেবে দেখি। আমাদের ক্ষীণ মস্তিস্কের জন্য আপনার প্রতি এই অসৌজন্য প্রকাশ করতে হচ্ছে বলে লক্ষ লক্ষ মার্জ্জনা চাইছি সুভাষবাবু। আমাদের একটু ভাববার সময় দিন।

চতুর্থ দৃশ্য

[টোকিও। সুভাষ চন্দ্র ও জেনেবেল ওসিমা।]

ওসিমা—তবে এই স্থির ?

সুভাষ — হাঁ।

ওসিমা—আমাব মুখও বাখবেন না ? আমি যে বড উঁচু গলা করেই প্রেমিয়াব জেনেবেল টোজোকে বলেছিলুম যে আপনি টোকিওতে এলেই ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে সব সমস্যাব সমাধান হযে যাবে। আমাব মন বলছিল যে আপনাব সঙ্গে একযোগে কাজ করলে আমবা লাভবানই হব।

সুভাষ — আপনাব মন ঠিকই বলেছিল জেনেবেল ওসিমা, জাপানেব বৃহত্তর স্বার্থ আমাব সঙ্গে একযোগে কাজ কবলেই সফল হবে। জাপান যদি ভাবতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তাব কবতে চায় তবে সে একূল ওকূল দুকূলই হাবাবে।

ওসিমা —আমি তা বুঝি সুভাষবাবু। কিন্তু জাপানেব বর্ত্তমান মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমস্ত পূর্ব্ব এশিয়া সে গ্রাস কবতে চায়। ধরুন, এই মনোভাব নিয়ে যদি সে স্বাধীন ভাবত গভর্ণমেণ্ট স্থাপনে বিবোধিতা কবে, তবে আপনি কি কববেন ?

সুভাষ — মনে বাখবেন জেনেরেল ওসিমা, আজাদহিন্দ্ সঙ্ঘের সুদৃঢ় একতাবন্ধন জাপান আজও ভাঙ্‌তে পাবে নি। মোহন সিং কে কাবাগাবে আবদ্ধ কবেও ভারতের জাতীয় সৈন্যদল হাত কবতে পাবে নি। প্রথম আই এন, এ, তারা ভেঙ্গে দিয়েচে তবু জাপানের অধীনে কাজ করতে বাজী হয় নি। আজাদহিন্দ্ সৈন্যদলের একটি সৈনিকও আজ পর্য্যন্ত জাপানের হুকুম মানে নি। টোকিওতে পদার্পন করেই ভারতীয়দের যে সম্বর্দ্ধনা লাভ

করেচি তাতে কি এখনও বুঝতে বাকি আছে যে আমি যেখানে গিয়ে দাঁড়াব সেখানেই পূর্ব্ব এশিয়ার ত্রিশলক্ষ ভারতীয় নরনারী আমায় ঘিরে দাঁড়াবে? তাদের সম্মিলিত উন্মাদনায় প্রাণের যে বন্যাস্রোত বয়ে যাবে সে কি উপেক্ষা করবার? আমি আজ আর সুভাষই নই জেনেরেল ওসিমা, বার্লিনের সেদিন আর নেই। আজ আমি বিশ্বভারতের নেতাজী।

ওসিমা — আপনাকে আমি চিনি সুভাষবাবু। জাপান শত্রু চিয়াংকাই-শেকের হাতে পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বত্র এক অপ্রত্যাশিত বিরাট গরীলা বাহিনী আমি তুলে দিতে চাইনে। আপনার ক্ষমতা আমার অবিদিত নয়। কিন্তু জাপান যদি আপনাকে সরিয়ে ফেলে তবে আপনার অবর্ত্তমানে এরা খুব ভয়ঙ্কর নাও হতে পারে।

সুভাষ — সে কথা কি আমিই ভেবে দেখিনি জেনেরেল ওসিমা? আত্মরক্ষা সম্বন্ধে আমিও আজ উদাসীন নই।

ওসিমা — তবু যদি জাপান বিরত না হয়?

সুভাষ — হ্যাঁ, যদি ওটা অগ্রাহ্য করে! তবে শুনুন, রুশিয়া আক্রমণ করে জার্ম্মানী নিজের যে সর্ব্বনাশ করেচে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে জাপানেরও সেই সর্ব্বনাশই হবে। ইংরেজকে যাই বলি না কেন, এ যে একটা বুলডগের জাত, শেষ কামড় সে একটা দেয়ই। ভারতীয়গণের সহায়তালেশ বঞ্চিত নীপন বাহিনী ব্রিটেনের সেই আক্রমণের মুখে যদি বা টিকতে পারে, মুমূর্ষু হয়েই টিকবে। পিছন থেকে আমেরিকার প্রবল মুষ্ট্যাঘাত সেই সুযোগে তাকে ধরাশায়ী করবে। জার্ম্মানী ও রুশিয়ার যুদ্ধে যারই জয় হোক, ভারতবর্ষের দিকে সে হাত বাড়াবেই। ভারতবাসীর আন্তরিক মৈত্রী লাভ না করে জাপান

যদি ভারত আক্রমণ করে তবে সে ভারতকে তো পাবেই না, মাঝখান থেকে চীন ও ভারতবর্ষ একযোগে এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে যে আমেরিকার হাতে তার পতন অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌বে। জাপান যদি পূর্ব্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠস্থান কামনা করে তবে ভারতবর্ষকে তুষ্ট করা তার প্রথম কর্ত্তব্য।

ওসিমা —আর যদি জাপান ভারত আক্রমণ না করে তবে আপনিই বা স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করে কি করবেন ?

সুভাষ — এবার সত্যিই হাসালেন জেনেরেল ওসিমা। ভারত আক্রমণ করা না করা এখন কি জাপানের হাতে ? ব্রহ্মদেশ রাখতে হলে ভারত সীমান্তে সুদৃঢ় প্রবল শত্রুদুর্গের অবস্থান সমরকুশলী নীপন বিপজ্জনক নয় বলে উড়িয়ে দেবে না। আর, নীপনের যদি সেই দুর্ব্বুদ্ধিই হয়, কথাটা উড়িয়েই দেয়, তবে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত শত্রুই কি তাকে বিরাম দেবে ? না, জেনেরেল ওসিমা, স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট মেনে নেওয়া ছাড়া জাপানের এখন আর গত্যন্তর নেই।

ওসিমা —আপনাকে কে আঁটবে সুভাষবাবু ? ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না বলেও জেনেরেল টোজো আপনার দাবী মেনে নেবে। শীঘ্রই সে সংবাদ আপনি পাবেনও। আমি টোজোর কাছ থেকেই আস্‌চি। আচ্ছা, আসি তবে।

পঞ্চম দৃশ্য

[সিঙ্গাপুর। দই তোযা গেকিজো। সুভাষচন্দ্র ও আজাদহিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের সচিবগণ দাঁড়াইয়া আজাদহিন্দ্ ফৌজের মিলিটারী সেলিউট্ লইতেছেন; সশস্ত্র ফৌজ ব্যাণ্ড বাজাইয়া মার্চ্চ পাষ্ট করিতেছে। বন্দেমাতরম্ গীত হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে মার্চ্চ পাষ্ট শেষ হইল। সুভাস চন্দ্র রষ্ট্রামে দাঁড়াইলেন। উচ্চ শির, সুদূর নিবদ্ধ দৃষ্টি, দেহে দৃপ্ত ভঙ্গী।]

সকলে —ইনক্লাব, জিন্দাবাদ্। আজাদহিন্দ্ জিন্দাবাদ্। জয় হিন্দ্।

সুভাষ — আর্জ্জি হুকুমতে আজাদহিন্দ্, স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট, আজ আমরা উদ্যাপন করছি, প্রথমেই স্মরণ করি আমার দীক্ষাগুরু দেশবন্ধুকে, আমার তপশ্চর্য্যায় তুষ্ট হয়ে যিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, "এই জীবনেই স্বাধীনতা লাভ কর"। স্মরণ করি ভারতগুরু মহাত্মাজীকে যিনি একাধারে ভারত স্বাধীনতা যুদ্ধের সার্ব্বভৌম অধিনায়ক ও দ্রষ্টা ঋষি। আর স্মরণ করি ভারত জননীর সেই বীর সন্তানগণকে যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শুধু স্বাধীনতার জন্য জীবন করেছেন ধারণ। জীবনে স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করি নি। ভুলে গেছি স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতা কেমন। পুরুষ পরম্পরায় পেয়েছি দাসত্বের উত্তরাধীকার। রক্তে দাসত্ব, অস্থিতে মজ্জায় দাসত্ব, দুর্ব্বাসার নিষ্ঠুর অভিশাপের মত সকল সার্থকতা থেকে আমাদের করেছে বঞ্চিত। যে ভারত মানবের আদিকাল হতে মানবসভ্যতার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল, জ্ঞানে, ধর্ম্মে, শৌর্য্যবীর্য্যে; সুখসমৃদ্ধিতে যার তুলনা ছিল না; আজও যার প্রতিভা থেকে থেকে সহস্র প্রতি-

কূলতাব মধ্যেই বিদ্যুতপ্রভাব মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠে. স্বাধীনতাহীন হয়ে তাব আজ কি দুর্দ্দশা। স্বাধীনতাহীনতাব পাপে সে আজ জগতে লাঞ্ছিত, অপমানিত। অপবেব ক্রীড়া-পুত্তলী, স্বাধীনতা হাবিয়ে সে আজ দাবিদ্র ও হীনতাব পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বহু দুঃখে, বহু নির্য্যাতন সয়ে, তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে স্বাধীনতাব মূল্য আজ বুঝেচে ভাবতবাসী। স্বাধীনতা যে কি অমূল্য সম্পদ আজ আব তাকে সে কথা বুঝিয়ে বলতে হয় না। আর্জ্জি হুকুমতে আজাদহিন্দ্ ভাবতেব স্বরাজ্য ফিবিয়ে এনেচে। স্বাধীনতাব পবশমণি তোমাদেব হাতে তুলে দিয়ে তোমাদেব নব অভ্যুদযেব কবেচে সূচনা। ইত্তেহদ, এতমদ ও কুববাণীব মন্ত্র দিয়ে এই স্ববাজ্যকে তোমবা প্রাণ দাও, জাগ্রত কব, বিকশিত কব। তোমাদেব বিবাট সার্থকতাব দিকে চেয়ে ছোট ছোট ভেদাভেদ, বিবাদ বুদ্ধি, সব ক্ষুদ্র গ্লানি ভুলে যাও। এক হয়ে তাকে বলীয়ান্ কব, নিষ্ঠা দিয়ে তাকে সজীব কব, সর্ব্বস্ব ত্যাগ কবে তাকে সংবক্ষণ কব। পৃথিবীব যে যেখানে আছ ভাবতবাসী, তুমি আজ এই স্ববাজ্যেব প্রজা। আব কাবো প্রজা তুমি নও। তুমি আব দাস নও, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। কত শতাব্দীব ধূলিলুণ্ঠিত শিব উঁচু কবে তুমি দাঁড়াও জগত সভায়। তোমাব বাজভক্তিব বিনিময়ে হুকুমতে আজাদহিন্দ্ তোমাব সর্ব্বার্থ বক্ষাব জন্য অগ্রসব হয়েচে।—ভাবতশত্রু! সাবধান! ভাবতবাসীব কেশাগ্র ও স্পর্শ কবলে হুকুমতে আজাদহিন্দে্ব হাতে তোমার নিষ্কৃতি নেই। ভাবতবাসীব ধন মান বক্ষাব ভাব আজ থেকে হুকুমতে আজাদহিন্দেব কবে ন্যস্ত।—

বড দুঃখে আজ হুকুমতে আজাদহিন্দ্ ভাবতেব বাইবে প্রতিষ্ঠা করতে হল। বিদেশী কবলিত ভাবতবর্ষে Occupied

India তে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল না। স্বরাজ্যের যাঁরা যোগ্য কর্ণধার তাঁরা সবাই আজ ভারতের অভ্যন্তরে কারারুদ্ধ। যে সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে স্বরাজ্যের উদ্বোধন হবে, ভারতের অভ্যন্তরে সে বাহিনী আজ নিরস্ত্র। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর থেকেই নিজের ঘৃণ্য প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আমাদের নিরস্ত্র করেচে। দস্যুতস্করের হাত থেকে, এমন কি বণ্য জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য, স্ত্রী পুত্র পরিজনকে বাঁচাবার জন্য আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। আজ তাই হুকুমতে আজাদহিন্দ্ এর প্রথম কাজ ভারতের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া, ভারতবাসীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া, ভারতের কারাগার ধূলিসাৎ করে দেওয়া। দিল্লীর সিংহাসন বিদেশীর হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে। লাল কেল্লায় আজাদহিন্দের বিজয়োৎসব করতে হবে। চলো দিল্লী।—

[সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সোচ্ছ্বাসে এই নূতন বাণীর অনুবৃত্তি করিল চলো দিল্লী, চলো দিল্লী।]

যে শত্রু আজ দিল্লী ও আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েচে, সে দস্যুকে শাণিত তরবারির তীক্ষ্ণাগ্র দিয়ে আহ্বান জানাতে হবে। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমেরিকা ব্রিটেনকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করচে বলে আমেরিকার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ বিঘোষিত হবে।

[তুমুল আনন্দধ্বনি ও প্রবল উৎসাহ সহকারে আজাদহিন্দ্, জিন্দাবাদ্, জয়হিন্দ্ ও নেতাজী কি জয় ধ্বনি]

জাপান, জার্মানী, ইটালী, থাইলেণ্ড, ফিলিপাইনস্, ক্রোয়েশিয়া, মাঞ্চুকুও, চীন, ব্রহ্মদেশ, সবাই হুকুমতে আজাদহিন্দ্‌কে ভারতের সত্যিকারের গভর্ণমেণ্ট বলে স্বীকার করেছে। আইয়ার থেকে ডি' ভেলেরা আমাদের জয় কামনা করে সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছেন। এঁরা আমাদের পরম মিত্র। স্বরাজ্যের এই অভিনন্দন যাঁদের হাত দিয়ে এসে আমাদের আশা ও ভরসা সঞ্জীবিত করল, জগত সভায় যাঁরা হাতধরে ভারতের ন্যায্য আসনে তাকে বসিয়ে দিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী অটুট হোক, অক্ষয় হোক। ভারতবাসী তাঁদের কখনো ভুলতে পারবে না, - আমাদের মিত্র-শক্তিরা সর্ব্বতোভাবে আমাদের সহায়তা করতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। তারা অঙ্গীকার করেছে যে ভারতের মাটি হুকুমতে আজাদহিন্দ্ এরই মাটি, অন্য কারো তাতে বিন্দুমাত্র অধিকার নেই, অধিকার থাকবে না. ভারতবাসী হুকুমতে আজাদহিন্দ্ এরই শাসনাধীন, অন্য কারো অধীন সে নয়। ভারতের যতটুকু শত্রুর কবলমুক্ত হবে তার সবটুকুই হুকুমতে আজাদহিন্দ্ এর ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার। হুকুমতে আজাদহিন্দ্ এর কাজে কোনো কারণেই এরা কেউ হস্তক্ষেপ করবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। জার্মানী, অথবা জাপানের গভর্ণমেণ্টের মতই হুকুমতে আজাদহিন্দ্ সম্পূর্ণ স্বাধীন।—আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলে জাপান হুকুমতে আজাদহিন্দ্‌কে সে দুটি উপহার দিয়েছে, সেজন্য মিত্র জাপানের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আজ থেকে এরা হুকুমতে আজাদহিন্দ্ এর শাসনাধীন। আন্দামান ও নিকোবর অতীতে যে ঘৃণ্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে তার হীন স্মৃতি চিরতরে মুছে ফেলবার জন্য, ভারত স্বাধীনতার অভ্যুদয়ে আমাদের প্রথম ভারতাধীকার কল্পে

আজ তাদের নূতন নাম আমি ঘোষণা করছি। আজ থেকে আন্দামান ও নিকোবর বিলুপ্ত হল। আজ থেকে তারা শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত হবে।

সকলে — শহীদ্ স্বরাজ জিন্দাবাদ্, আজাদ্‌হিন্দ্ জিন্দাবাদ্ ভারতমিত্র কি জয়।

সুভাষ — হুকুমতে আজাদহিন্দ্ এর রাষ্ট্রপতি হয়ে শপথ গ্রহণ করতে যাচ্ছি। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের কত কথাই না মনে ভিড় করে দাঁড়িয়েচে। একটা তুমুল উচ্ছ্বাস আমার কণ্ঠরোধ করচে। জীবনের পরম মুহূর্ত্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠ্‌চে। ভারতমাতার আশীর্ব্বাদে কণ্ঠ যেন কেঁপে না যায়, দেহমন যেন অবিচলিত থাকে—

[দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া শপথবাণী উচ্চারণ]

"ভগবানের নামে এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করচি যে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের আটত্রিশ কোটি অধিবাসীর মুক্তির জন্য আমি, সুভাষচন্দ্র বসু, স্বাধীনতার এই ধর্ম্ম যুদ্ধ আমার শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ও উদ্‌যাপন করব।"—

[চোখে অশ্রুধারা নির্গত হইল। কণ্ঠরুদ্ধ হইল। সুভাষচন্দ্র বার বার উচ্ছ্বাস রোধ করিয়া শপথ উচ্চারণ করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জনতা উদগ্র হইয়া ব্যাকুল নয়নে সুভাষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সুভাষ কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন]

"আমি চির দিন ভারতবর্ষের সেবক থাকব এবং আটত্রিশকোটি

ভারতীয় ভ্রাতা ভগ্নীর মঙ্গলানুশীলনে রত থাকব। তাই আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হবে। স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরও ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যান্ত দান করতে আমি চিরদিন প্রস্তুত থাকব।"

[বিপুল জয়ধ্বনি ও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত। সচিবগণ একে একে স্বভাবচন্দ্রের নিকট শপথ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। [illegible] তোপধ্বনি হইল। এরোপ্লেন হইতে পুষ্প বর্ষিত হইল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[সিঙ্গাপুর। সুভাষচন্দ্র ও আজাদহিন্দ্ ফৌজের সৈন্যদল।]

সৈন্যগণ —নেতাজী কি জয়।

সুভাষ — যুদ্ধে অগ্রসর হও। যে যুদ্ধে আর পিছনে ফিরবার পথ নেই। যে যুদ্ধে পরাজয় নেই। হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি। স্বাধীনতার ব্রত গ্রহণ করে কবে থেকেই তিনটি স্বপ্ন দেখতুম। প্রথম স্বপ্ন, ভারতের মুক্তিফৌজ। দ্বিতীয় স্বপ্ন, স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট। তৃতীয় স্বপ্ন, স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে স্বাধীনতা যুদ্ধ ও সেই যুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জ্জন। আমার প্রথম ও দ্বিতীয় স্বপ্ন সফল হয়েচে। ভারতের মুক্তিফৌজ আজ আর কল্পনাই নয়; স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট আজ আর স্বপ্নই নয়। তারা আজ প্রত্যক্ষ সত্য। আমার তৃতীয় স্বপ্নও সফল হবে। স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীনে স্বাধীনতা যুদ্ধ সুরু হয়েচে। সেই যুদ্ধে তোমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন কর। আমার তৃতীয় স্বপ্ন সফল কর! অগ্রসর হও।—

ভারতের অভ্যন্তরে যে নিরস্ত্র বিপ্লব প্রবল শত্রুর অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে, তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তোমাদের কাছে পেলে স্বাধীনতা লাভ সুনিশ্চিত জেনে সেই মুমূর্ষু বিপ্লব লক্ষ প্রাণ নিয়ে আবার বেঁচে উঠ্‌বে। বিপ্লবের বন্যাস্রোত বইবে। সেই বন্যাস্রোতে ভারতশত্রু ঐরাবতের মত ভেসে যাবে, ডুবে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অগ্রসর হও।—মনে রেখো, ভারতের নারী তোমার মাতা, ভারত সন্তান তোমার ভাই। তোমাদের হাতে তাদের অমর্য্যাদা না হয়। যুদ্ধ ব্যবসায়ী সৈনিকই নয়, পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয় নরনারীর সম্মিলিত সেনাদল তোমরা। কেউ ছিলে শ্রমিক, কেউ ছিলে

ধনিক, কেউ ছিলে মসীজীবী, কেউ ছিলে আইনজীবী, কেউ ছিলে ছাত্র, কেউ ছিলে শিক্ষক। আজ স্বাধীনতার আহ্বানে সব কাজ ফেলে দিয়ে অস্ত্র তুলে নিয়েচ হাতে। যারা স্বেচ্ছায় এসেছ তারাই মুক্তি ফৌজে যোগ দেবার অধিকারী। যদি কেউ অনিচ্ছায়, জনমতের চাপে, অথবা ইতস্তত করতে করতে এসে পড়ে থাক, বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত কেউ থাক, তবে ফিরে যাও কিছু বলব না। কায়মনোবাক্যে যারা মুক্তিফৌজ নও তারা কাজের বাধা। তারা সরে দাঁড়াও, জনে জনে বলচি, এই সময় তারা চলে যাও। তোমাদের সামনে অনাহার, অনিদ্রা, ক্ষুধার অন্ন হয়তো জুটবে না। তৃষ্ণার জল মিলবে না, দুঃখ কষ্ট অভাবের মধ্যেই পথ করে চলতে হবে। বুকের রক্ত দিতে হবে, দুর্গম পথে দুরূহ কাজে মৃত্যুবরণ করতে হবে। যারা ভয় পাও তারা এবার পিছিয়ে যাও।

[সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে
সুভাষ আবার বলিলেন]

যদি কেউ ভয় পাও, যদি কেউ দ্বিধাগ্রস্ত থাক, তবে এখনও ফিরে যাও।

[সকলে স্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে সুভাষ বলিলেন]

কই, কেউ কি যেতে চাও না? তোমরা সবাই সব সইতে প্রস্তুত?

সকলে —আমরা সবাই একমন, একপ্রাণ। আমরা স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেব। কিছুতেই পিছিয়ে যাব না, যা আসে আসুক।

সুভাষ — সাবাস্! তবে অগ্রসর হও ভারত মাতার বীর সন্তান! ভারতমাতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে গগন পবন কাঁপিয়ে চল। ভয় কি?

[বিপুল ধ্বনি, নেতাজী কি জয়! নেতাজী কি জয়!!]

সুভাষ — ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে যখন বিজয় গর্ব্বে ভারতে প্রবেশ করবে, তখন আর কোন অভাব রইবে না। ভারতবাসীর যদি একমুঠো অন্ন জোটে তবে তোমাদেরও জুটবে। তখন সব পাবে। কলকাতা থেকে বম্বে, রাওলপিণ্ডী থেকে মাদ্রাজ, ভারতের সর্ব্বত্র ভারতীয় অর্থে অগণিত বিশাল সৈন্য শিবির ইংরেজ সেনানীর ব্যবহারের জন্য তৈরী হয়ে আছে। এই সুগঠিত শিবিরগুলি তোমরা পাবে। নূতন করে তোমাদের জন্য কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। [গূঢ় হাস্যে] তার বিনিময়ে ভারতের শতসহস্র সুদৃঢ় কারাগার ইংরেজ সৈনিককে আমরা আনন্দে উপহার দেব। [প্রবল হাস্যধ্বনি]
হুকুমতে আজাদহিন্দের আদেশে, মেজর জেনেরেল শা-নওয়াজ ও কিয়ানীর অধীনে তবে অগ্রসর হও মুক্তিসেনা। রণে অপরাজেয় হও, শত্রু নিপাত কর। কে বাঁচব, কে মরব, সে হিসাব আজ নয়। শুধু বল্‌চি সুখে দুঃখে, জয়ে বিপর্য্যয়ে, জীবনে মরণে, আমি সঙ্গে থাকব। সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে আমাকে তোমাদের মধ্যে দেখ্‌তে পাবে। চলো দিল্লী।—

সকলে —চলো দিল্লী, চলো দিল্লী।

সুভাষ — অগ্রসর হও।

[কদম কদম বাড়ায়ে যা গাহিতে গাহিতে সৈন্যগণ মার্চ্চ আরম্ভ করিল। ঝান্সী বাহিনী ও তার মধ্যে দেখা যাইবে। কিছুক্ষণ সৈন্যগণ ষ্টেজের একদিক দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্যদিক দিয়া নির্গত হইতে থাকিবে। ত্রিবর্ণ পতাকা হস্তে মার্চ্চ সুরু হইবে।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আরাকানে ব্রিটিশ পার্ব্বত্য দুর্গ। প্রত্যুষ কাল। তিনটি ব্রিটিশ সেন্ট্রি পাহারা দিতেছে। দুইজন একত্র দাঁড়াইয়া আছে ও একজন টহল দিতেছে।]

১ম টমি—উঃ, কি মশা।

২য় টমি—যেমন জঙ্গলী দেশ, তেমন তার জঙ্গলী ব্যাপার! কর্ত্তারা বললে মশারী টানাও মশা লাগ্‌বে না।—

১ম টমি—কর্ত্তারা বললে!—আরে ধ্যুত্তোর তোর মশারি! মশারির ভিতরই তো যত মশার আড্ডা। দেখ্‌না, আমার সারাটা গা দেখ্‌!

২য় টমি—আমার দেখ্‌ না! এই দেখ্‌, এই দেখ্‌—। এখানকার মশা-গুলো পর্য্যন্ত ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন মানে!!

১ম টমি—কত কষ্ট করে সাম্রাজ্য রাখতে হয় দেখচিস্‌?

৩য় টমি—কি হে, কি কথা হচ্ছে তোমাদের? খাসী মেয়ের কথা, না মণিপুরী মেয়ের কথা? যাই বল ভাই, দেশের গোঁয়ার মেয়ে-গুলোর চাইতে এরা কিন্তু অনেক ভাল।

১ম টমি—খাসী মেয়ের কথা কে বলচে? আমার সারা গা জ্বলে যাচ্ছে আর তুমি আছ তোমার খাসী মণিপুরী মেয়ের ইয়ারকি নিয়ে।

৩য় টমি—সারা গা জ্বলে যাচ্ছে? বল কি হে? তোমারটিকে নিয়ে কে আবার চম্পট্‌ দিলে? অ্যাঁ!

২য় টমি—[হাসিয়া] না, না, মশার কামড়ের কথা বলচে।

৩য় টমি—মশা ? রামবল, ও আবার কামড়ায় নাকি ? আমি তো রাত দুপুর পর্য্যন্ত নেশায় বুঁদ হয়ে থাকি, মশাব কামড় টেরই পাই নে। আর বাকী রাতটা মশাগুলো আমাব বক্ত খেয়ে খেয়ে এমন ঝিমিয়ে পড়ে যে কামড়াতেই চায় না।

১ম ও ২য় টমি—হা, হা, হা !

১ম টমি—মশাগুলোকে আর মদ ধরিও না। এখানে যা মদ আছে, ইঞ্চি, ইঞ্চি করে খেয়ে ও মনে হয় এই বুঝি ফুরিয়ে গেল।

২য় টমি—ও নেটিভদের পচা মদ কোথেকে এনে এনে খায় কি না !

৩য় টমি—আরে শোন্, শোন্, মশাব কথায় একটা ভাবি মজাব গল্প মনে পড়ল। এক ইয়াঙ্কী কখনও জোনাকী পোকা চোখে দেখে নি। সে যখন প্রথম বার্ম্মায় যুদ্ধ করতে এল তখন তাঁবুতে ওবা বললে মশারি খাটিয়ে নিতে, নইলে মশা কামড়াবে। কাপড ছেড়ে মশারীর ভিতর যেই সে শুয়েচে অম্নি কোথা দিযে যে মশাগুলো ঢুকেছিল তারা কামড়াতে সুরু করলে। সে ভাবলে মশাবীটা মশার ট্র্যাপ বোধ হয়। তা মশাগুলো যখন ট্র্যাপে পড়ে গেছে তখন মশারির বাইরে শুতে যাওয়াই উচিত। এল মশারি ছেড়ে বেরিয়ে। এখন বাইরে শুতে গিয়ে বেচারা তো মশার কামড়ে আরো নাজেহাল। তখন সে ভাবলে যে অন্ধকাবে কোথাও চুপমেরে বসে থাকলে মশা তাকে দেখতে পাবে না। তাই মোমবাতিটা ফের নিবিয়ে দিয়ে সে পিছনের এক কোণে গুড়ি মেরে বসে রইল। এমন সময় কটি জোনাকি পোকা তার চোখে পড়ল। মিট মিট করে খানিক তাকিয়ে থেকে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চোঁচা দৌড় দিলে, বললে, নাও আই গিভ্

আপ্, আর পারলুম না রে বাবা! এবার মশাগুলো মুখে কণ্ঠন নিয়ে আমাকে খুঁজতে আস্‌ছে।—

[সকলের উচ্চহাস্য।—অনতিদূরে পাহাড়ী রাস্তা দিয়া দশ বারোটি পাহাড়ী পুরুষ ও মেয়ে শাকসব্জী ফলমূল লইয়া বাজারে যাইতেছিল। বাজার অনেকটা দূর বলিয়া খুব ভোরেই রওয়ানা হইয়াছে।]

২য় টমি—[আঙ্গুল দিয়া দেখাইল] ঐ দেখ কারা বাজারে যাচ্ছে।

৩য় টমি—তাই নাকি? রি, রি—

১ম টমি—পাক্‌ড়ো!

[১ম ও ৩য় টমি দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের ধরিয়া আনিল।]

১ম টমি—ওটাতে কি আছে দেখি, দেখি? আরে। বেশ লাগচে তো খেতে!

[খাইতে লাগিল। টমিত্রয় মিলিয়া খাদ্য অখাদ্য কিছু কিছু ছড়াইয়া ফেলিল। চূণ টুন মুখে দিয়া থু, থু করিল। ফল খাইয়া আহ্লাদে নাচিল।]

৩য় টমি—হুররে! সব রেখে দাও। কিছু ছেড়ো না। ক্যাম্পে আজ সারপ্রাইজ দেব। হা, হা, হা।

১ম টমি—এই সব রেখে যা।

পাহাড়ী—পয়সা?

১ম টমি—পয়সা?

৩য় টমি—পয়সা? [এ পকেটে ও পকেটে হাত ঢুকাইয়া হাত বাহির করিয়া]

বাঃ একটাও নেই।

১ম টমি—পালা, পালা, সম্রাটের সৈন্য পয়সা দিয়ে খায় না।

২য় টমি—তোদের আমরা সভ্য করেচি। তোরা পয়সা চাস্?

৩য় টমি—কাটা কাটি মারা মারি করতিস্। এখন সুখে বসবাস করচিস্। এই উপকারটা কে করেচে, হ্যা? কে করেচে?

১ম টমি—জাপগুলো তেড়ে এসে তোদের ধরে ধরে খেয়ে ফেল্‌ত, বাঁচালে কারা? তোদের জানপ্রাণ রক্ষা করচে কারা? যা ভাগ্।

পাহাড়ী—পয়সা?

১ম টমি—এ্যাও! ফের পয়সা?

৩য় টমি—আবার পয়সা? পালা।

২য় টমি—নেটিভগুলো ভারি বদমাস্। যা এখান থেকে। গেলি?

১ম টমি—তবু দাঁড়িয়ে রইলি! আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা। ধর তো, ধর তো, সব কটাকে জেলে নিয়ে পুরব।

৩য় টমি—গুলি করব।

[তিনজনই রিভলবার লইয়া দাঁড়াইল। পাহাড়ীগুলি ভয় পাইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।]

৩য় টমি—ঐ মেয়েটা, কি বলে, দেখতে বেশ না? ধর ধর—

[দৌড়িয়া মেয়েটাকে গিয়া ধরিল। মেয়েটা চিৎকার করিতে লাগিল। পাহাড়ীগুলি একবার ফিরিয়া চাহিতেই টমিত্রয় রিভলবার তাক করিয়া ধরিল। পাহাড়ীরা পালাইল।]

৩য় টমি—হা, হা, হা, বেড়ে মুখখানা। অত চেঁচামেচি করচ কেন ডার্লিং?

[দীর্ঘ চুম্বনে চিৎকার নিরুদ্ধ করিতে লাগিল ও পাহাড়ী মেয়ে সাধ্যমত আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্য টমিগুলি হাততালি দিতে লাগিল ও মজা দেখিতে লাগিল।—পিছন হইতে আজাদহিন্দ্ ফৌজের অগ্রসরদল প্রবেশ করিল]

আজাদহিন্দ্ কমাণ্ডার—দেখ, দেখ, কুকুরগুলোকে একবার দেখ। গুলি করো না। বাট্ দিয়ে মার। শিবিরকে সতর্ক না করতে পারে।—

[ফৌজের তিনজন নিঃশব্দে তিনটি টমির দিকে ছুটিল ও তাহারা পদশব্দে ফিরিয়া চাহিতে না চাহিতে বাট্ এণ্ড্ দিয়া মাথায় মারিয়া টমিত্রয়কে ধরাশায়ী করিল। অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিল। টু শব্দটিও হইল না।]

কমাণ্ডার—সাবাস! এবার যাও, সঙ্কেত দাও, দুর্গ আক্রমণের এই সুযোগ।— [মেয়েটিকে তুলিয়া ধরিল]

কি হয়েচে বল তো?

[মেয়েটি কাঁদিতে লাগিল। কমাণ্ডার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া ছড়ান ফলমূল দেখিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল ও টমিগুলোর পকেট হাতড়াইয়া যাহা পাইল সবই মেয়েটির হাতে তুলিয়া দিল]

বাড়ী যাও। কেঁদ না। [চোখ মুছাইয়া দিল]

আমরা এসে পড়েচি। আর তোমাদের ভয় নেই।

[ছোট মোটর গাড়ীতে মেজর জেনেরেল শানওয়াজ ও চারজন কর্ণেলের প্রবেশ।]

শানওয়াজ—[কমাণ্ডারের সিলিউট্ লইয়া] খবর কি কমাণ্ডার?

কমাণ্ডার—গেটের সেন্ট্রিগুলো ঐ পড়ে আছে। দুর্গকে সতর্ক করবার অবকাশ পায় নি। গেট খোলা পড়ে আছে। এই সুযোগ।

শানওয়াজ বাহবা! বেশ, বেশ, দুজন সেন্ট্রিগুলোর পাহারায় থাক। উঠবার চেষ্টা করলেই বন্দী করবে।— [সহচর কর্ণেলগণকে] দুর্গ প্রাকারের ভিতরে আর্টিলারি পজিশন নাও। দুর্গের বাইরে ট্যাঙ্ক দিয়ে টহল দাও। হেড্ কোয়ার্টার্স এ রেডিও কর। জাপানী বিমানকে খবর দাও। যাও।—

[মিলিটারী সেলাম করিয়া গাড়ীতে কর্ণেল চতুষ্টয়ের প্রস্থান।— ডবল কুইক্ মার্চ্চ করিয়া আজাদহিন্দ্ ফৌজের রেজিমেণ্ট আসিয়া পৌছিল।]

শা-নওয়াজ—হল্ট্।

সৈন্য! তোমাদের সামনে অগ্নি পরীক্ষা। দুর্গ জাগবার আগে চার্জ্জ করতে হবে। শত্রুসেনা তৈরী হবার আগেই দুর্গ দখল করা চাই। আগে কামানগুলো দখল কর। রসদ নষ্ট করতে দিও না। যদি যুদ্ধ করে গুলি করবে। যদি পালায় বন্দী করবে। অগ্রসর হও।—

[হুড়মুড় করিয়া আজাদহিন্দ্ ফৌজ দুর্গ প্রবেশ করিল। ষ্টেজ খালি হইল। অল্পক্ষণেই ষ্টেজের এক দিক দিয়া সদ্যনিদ্রোত্থিত শত্রুসেনা প্রবেশ করিল ও আজাদহিন্দ্ সৈন্য পিছু পিছু বেওনেট চার্জ্জ করিল। শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ষ্টেজ খালি হইল। নেপথ্যে গোলাগুলির কর্ণ বধিরকারী শব্দ হইতে লাগিল ও আহতের আর্ত্তনাদ ছাপাইয়া বার বার নেতাজী কি জয় ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল।—পুনঃ পুনঃ একদিক দিয়া শত্রু সেনা প্রবেশ করিবে ও আজাদ্হিন্দ্ সৈন্য পিছু পিছু বেওনেট চার্জ্জ করিয়া আসিবে। দুইদলে কিছুক্ষণ হাতাহাতি যুদ্ধ হইবে ও শত্রু-সেনা হতাহত ফেলিয়া পলায়ন করিবে। আজাদহিন্দ্ সৈন্য "আজাদ-হিন্দ্ জিন্দাবাদ্" ও "নেতাজী কি জয়" ধ্বনি সহ যুদ্ধ করিবে।—

এক সময় সব কোলাহল ছাপাইয়া বিউগ্‌ল শোনা যাইবে। যুদ্ধ থামিবে।]

শা-নওয়াজ—[প্রবেশ করিতে করিতে] সাবাস, সাবাস, ওরা সাদা নিশান তুলেছে। আরাকানের দুর্গ দখল হল। চলো দিল্লী—

সকলে—চলো দিল্লী।

শা-নওয়াজ—নেতাজী কি জয়।

সকলে—নেতাজী কি জয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[বার্ম্মা সীমান্তে সুভাষচন্দ্র ও আজাদহিন্দ্ সৈন্যদল ।]

সকলে—নেতাজী কি জয়।

সুভাষ — এগিয়ে চলো, আবো এগিয়ে চলো, ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

ভাবত স্বাধীনতার সত্যিকার যুদ্ধক্ষেত্র এখনও দূরে। এগিয়ে চল মুক্তি সেনা। পদভরে বিশ্ব টলমল করে উঠুক। শত্রু ত্রাসে মূর্চ্ছিত হোক্। এগিয়ে চল দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী। তোমাদের শৌর্য্য বীর্য্য তোমাদের আত্মাহুতি ধরণী স্তম্ভিত হয়ে দেখুক। রক্ত দাও, আবো রক্ত দাও, রক্ত চাই। তুম হামকো খুন দো, ম্যয় তোমকো আজাদী দুঙ্গা, আক্রমণ কর, শত্রুকে আক্রমণ করে পথ করে লও, আক্রান্ত হবার অপেক্ষায় থেকো না। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম আক্রমণই রণকৌশল। আক্রমণের ইনিসিয়েটিভ্ কেড়ে নিতে হবে। আক্রমণের উদ্যোগ ও নির্ব্বাচন যার হাতে, বিজয়লক্ষ্মী তারই হাতে। চলো দিল্লী—

সকলে—চলো দিল্লী—

[ব্যাণ্ড বাজিল। কদম কদম বাড়ায়ে যা গাহিতে গাহিতে মার্চ্চ করিয়া ত্রিবর্ণ পতাকা উড়াইয়া সৈন্যদল ষ্টেজ হইতে নির্গত হইতে থাকিবে]

তৃতীয় দৃশ্য।

[রেঙ্গুন। সুভাষচন্দ্র ও ঝান্সী বাহিনী।]

সকলে — নেতাজী কি জয়।

কেপ্টেন লক্ষ্মী - নেতাজী আর তো আমি ঝান্সী বাহিনীকে ভুলিয়ে রাখতে পারচি না। তারা যুদ্ধ করতে চায়, যুদ্ধাস্ত্র হাতে নিয়ে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করবার জন্য, তারা অধীর হয়ে উঠেচে, আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারচি নে। পিছনের শিবিরে, হাসপাতালের কাজে, নিরাপদ আশ্রয়ে, প্রচার, গঠন, যোগানের কাজ নিয়েই তারা থাকতে চায় না। তারা সম্মুখ সমরে প্রাণ দিতে চায়। তুমি তাদের বলেচ তারা প্রত্যেকে যেন ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইকে তাদের আদর্শ করে চলে। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে শত্রুসৈন্যের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তারাও তাই চায়। সৈনিকের মত সামরিক শিক্ষা তোমার আদেশেই তারা পেয়েচে। সে শিক্ষার কি এই পরিণাম? যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের শক্তি পরীক্ষা কি কোনো দিনই হবে না? তুমি আসবার আগে আজাদহিন্দ সঙ্ঘ নারী বাহিনীর কথাটা আমলেই আনে নি। তুমিই প্রথমে নারীবাহিনী গড়ে তুলতে আমাকে আদেশ দিয়েচ। আজ তুমিও বিমুখ হয়ে আমাদের মর্যাদা লাঘব করো না। নেতাজী! অনুমতি দাও নেতাজী! এক সহস্র ঝান্সীবাহিনীর সৈনিক তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে নেতাজী।

সুভাষ—তোমরা যুদ্ধ করতে চাও?—ভেবে দেখেচ কি, যুদ্ধক্ষেত্রে যে ভয়াবহ মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয় তোমরা তা পারবে?

লক্ষ্মী —পারব না তো কি? বোমারুর আক্রমণে যে ভয়াবহ মৃত্যুকে

চোখের সামনে প্রতিদিন দেখতে হচ্ছে, তা যদি সইতে পারি, ওটা পারব না? আমাদের স্বামী পুত্র যা সইতে পারে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা তা সইতে পারব না?

সুভাষ —যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল দেহশক্তির প্রয়োজন, অমানুষিক শ্রমের প্রয়োজন নিষ্ঠুর ব্যাধের মত কঠোর প্রাণ নিয়ে দুর্গম দুরূহ পথে অজ্ঞাত শিকারের বক্ষ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিদ্ধ করতে হবে, সে কি তোমাদের কাজ?

লক্ষ্মী —পুরুষদের সকলেরই কি তোমার মত বিপুল দেহশক্তি আছে, অমানুষিক শ্রমের ক্ষমতা আছে? তারা যুদ্ধ করে কি করে? আর নিষ্ঠুরতা? শাবকের জন্য সিংহীর হিংস্রতা কখনো দেখ নি?—

সুভাষ —লক্ষ্মী! তুমি ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ছাড়া আর কেউ নও। ঝান্সীর রাণীই আবার এসেচ আমাদের মাঝখানে। শোন, সব কাজ কি সবাই পারে? না সব কাজ সবাই পারলেই কাজটা ঠিক হয়? যে কাজের ভার তোমাদের 'পরে ন্যস্ত আছে, পুরুষ কি তোমাদের মত এমন করে সে কাজগুলো করতে পারে? আজ যোগ্য হাতে যোগ্য কাজটি না থাকলে আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব, আজাদহিন্দ্ ফৌজের একটি অঙ্গও যদি দুর্ব্বল হয় তবে প্রবল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কখন যে সেই অঙ্গ দিয়ে তার মৃত্যুআঘাত আসবে কে বলতে পারে?

লক্ষ্মী —নেতাজী! [মাথা নত করিল]

সুভাষ —কি বলবে, বল লক্ষ্মী।

[সহসা তাকাইয়া দেখিলেন কেপ্টেন লক্ষ্মীর চোখে জল, ঝান্সী বাহিনীর চোখে জল]

একি তোমরা কাঁদ্‌চ?—

[সকলে মুখ অন্য দিকে ফিরাইল]

স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য কাঁদচ ? একি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখালে ভারত জননী ! ধন্য, ধন্য ভারত রমণী ! স্বদেশকে এত ভালবাস তোমরা ? তবে মুখ তোল, মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। আর দ্বিধা নেই সংশয় নেই।—

ভারতের অভ্যন্তরে মহাত্মাজীর অহিংসা বাহিনী শুধু পুরুষ দিয়েই তৈরী হয় নি, নরনারীর সম্মিলিত বাহিনী হয়েই তা গড়ে উঠেচে। কে বলতে পারে এমন কথা যে চরম দুঃখ কষ্ট নির্যাতনের মুখে নারী সেখানে পিছিয়ে গেছে ? দেশের আহ্বানে ভারতের লক্ষ লক্ষ বীরাঙ্গনা একদিনে অন্তঃপুরের সকল আবরণ ভেদ্ করে বেরিয়ে এল। অহিংস যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কত নারী প্রাণ দিল কত অঙ্গহীন হল। কত কারাবরণ করল। কত বুক পেতে শত্রুর আঘাত গ্রহণ করল। ত্যাগে, বীর্য্যে, সহনশীলতায়, ভারতনারী সর্ব্বাংশে পুরুষের সমকক্ষ, এক তিল কম নয়। তবে যে যাই বলুক, আমি অনুমতি দিলুম। তোমরা রণে অগ্রসর হও। তোমাদের আদর্শ ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। তোমাদের শক্তির পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হও। জগতকে দেখাও যে প্রয়োজন হলে ভারতনারী মুক্ত তরবারি হস্তে শত্রুব্যূহের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে আজও কুণ্ঠিত নয়। অগ্রসর হও। চলো দিল্লী—

সকলে [তুমুল উৎসাহে] চলো দিল্লী, চলো দিল্লী—

[কদম কদম বাড়ায়ে যা গাহিতে গাহিতে মার্চ্চ করিয়া ঝান্সী-বাহিনী ষ্টেজ হইতে নির্গত হইল]

[রেঙ্গুন। জ্যোতির্ম্ময় ও জয়শ্রীর গৃহ।]

জয়শ্রী — জয়হিন্দ্!

জ্যোতির্ম্ময়—জয়হিন্দ্!

জয়শ্রী — কি সুন্দর, না গো, এই জয়হিন্দ্?

জ্যোতির্ম্ময়—হ্যাঁ, শ্রী। ভারতের জাতীয় সম্ভাষণ। ভারতের নবীন সম্ভাবনার বাণী।

জয়শ্রী — ছোট্ট একটুখানি কথা, কিন্তু মনকে কেমন নাড়া দিয়ে যায়! কনভেণ্টে যখন পড়তুম তখন গুড্ মর্ণিং মেডাম, গুড্ ইভনিং স্যর, গুড্ নাইট ডার্লিং, দিনরাত করতে হত। মনের সঙ্গে তার সামান্যই যোগ ছিল। বাড়ীতে প্রণাম করতুম কিন্তু সেটা সত্য ছিল বিশেষ একটা ক্ষণের জন্য। নমস্কারের তো মানেই ছিল না। গতানুগতিক সৌজন্যই ছিল ওগুলোর উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন জয়হিন্দ্ বলি, দেখা হলে পরস্পরকে সম্ভাষণ করি জয়হিন্দ বলে। মনে প্রাণে অনুভব করি নবীন জীবনের সাড়া যেন লাগে। আর তুমি?

জ্যোতির্ম্ময়—অত সুন্দর করে তো বলতে পারব জয়শ্রী, কিন্তু মনে হয় ভারতের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসী সেখানে এক হয়েছে, সেই মোহনায় এম্নি উদার সর্ব্বাশ্রয়ী বাণীরই প্রয়োজন। বিশ্বভারত যেখানে এক সেখানেই নেতাজী নির্দ্দেশ করেছেন জয়হিন্দ্ বাণীতে। ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে বিশাল ভারতের বলিষ্ঠ রূপ যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর কণ্ঠে এই নবীন ভাষা সত্য হয়ে ফুটেছে বলেই বিশ্ব ভারত ছোট ছোট

গণ্ডী পেরিয়ে এক মুহূর্ত্তে তাকে চিনে নিয়েচে। কে আছ ভারতবাসী যার মন এই বাণীতে সাড়া দেয় না? এক জাতি, এক চিন্তা, এক সার্থকতার আনন্দ বিস্ময় অনুভব করে না এমন কি কেউ থাকতে পারে?

জয়শ্রী।— মনে পড়ে নেতাজী আসবার আগে কি ছিলুম। তুমি ছিলে তরুণ ব্যারিষ্টার, আমি তোমার যোগ্যা পত্নী। ক্লাব করতুম, ব্রিজ খেলতুম, গসিপ ও পার্টি, সাড়ী ও গয়না, সিনেমা ও মেক আপ্ এই তো ছিল জীবন। প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ফটো রাখতুম, বলতুম ডার্লিং। হাসি পায়।—

এম্নি মোহাচ্ছন্ন দিনে যখন ভৈরবের তাণ্ডব সুরু হল, মৃত্যুকে মুখোমুখি দেখলুম, ক্ষুধার নগ্নরূপ, জীবনের বীভৎস মূর্ত্তি, আদিম প্রবৃত্তির পঙ্কিলাবর্ত্ত মুখব্যাদন করে এগিয়ে এল, অতীতের সূক্ষ্ম গ্রন্থিগুলি নিমেষে টুটে যেতে লাগল, বিহ্বল বিভ্রান্ত চেতনায় তলিয়ে যেতে যেতে সেই চরম দিনে কার হাতখানি পেলুম বলো না গো! আজীবন সোণার অক্ষরে বুকে লেখা রইল, ইত্তেহদ্! তুমি আর একা নও জয়শ্রী, আমাদের তুমি, তোমার ভাবনা আমাদের ও ভাবনা, এসো হাতবাড়িয়ে দাও। ইত্তেহদ্।

জ্যোতির্ম্ময়—হ্যাঁ, শ্রী, ইত্তেহদ্ এল শক্তির বাণী নিয়ে। যতবড় ইত্তেহদ্ ততবড় শক্তি। ইত্তেহদ্ মন্ত্রে যে দুর্জ্জয় শক্তি জেগে উঠল, দেখতে দেখতে তার অমীত দীপ্তি প্রলয় অন্ধকার ছাপিয়ে উঠল। মূঢ় হাহাকার ঘুচিয়ে দিয়ে পূর্ব্ব গগনে নবীন সম্ভাবনার অরুণ রশ্মি দেখা দিল, জয়হিন্দ্!

জয়শ্রী— তুমি আজাদহিন্দ্ সঙ্ঘে যোগ দিলে। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে মুক্তি-ফৌজের সৈনিক বেশে! আমাকে এসে বল্লে

শ্রী, অতীতকে আর ফিরে চাইনে। যারা আমার ইত্তেহদ্ কেড়ে নিয়েছিল তাদের অঙ্গ হয়ে আর থাকবো না। স্বাধীনতার নিঃশ্বাস জীবনকে মধুময় করেছে, আজ মাথা উঁচু করে জগতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। মুক্তির স্বাদ যতদিন পাইনি ততদিন নিজেকে বিদ্রুপই করেচি শুধু, সত্য হয়ে উঠেনি। বললে, নেতাজীর নির্দ্দেশ ইত্তেহদ্, সেই ইত্তেহদ্ সত্য করে তুলতে হবে, এক মন, এক প্রাণ, এক ভাষা হবে আমাদের।

জ্যোতির্ম্ময়—তুমি আজাদহিন্দ্ সঙ্ঘে যোগ দিলে। ফিরে এলে নবীন সার্থকতায় ঝলমল। তোমার চোখে মুখে কি উৎসাহ, কি অপূর্ব্ব দীপ্তি! মনে হল আমার ছোট্ট জয়শ্রী আজ বিশ্ব ভারতের জয়শ্রী হয়ে আপন মহিমায় জ্বলে উঠল। ঝান্সী বাহিনীর সৈনিক বেশে এলে। কত শ্রদ্ধায়, কত সম্ভ্রমে তোমাকে বরণ করে নিলুম।

জয়শ্রী — হ্যাঁ গো, জানি, নূতন করে পরিচয় হল আমাদের, নূতন করে দেখা হল জগতের সঙ্গে। সেকি ভুলতে পারি? তারপর সুরু হল কাজ। দেখতে দেখতে এক ভাষায় দীক্ষা হয়ে গেল, রোম্যান হরফে হিন্দুস্থানী। আজ পূর্ব্বএশিয়ার ভারতীয় কে না জানে? মুখের ভাষা নেতাজীর নির্দ্দেশে এক হয়ে গেল। অন্ধ্র, তামিল, দ্রাবিড়, বাঙ্গালী, উৎকলী সবাই কি প্রেরণায় তিনমাসে এই ভাষা আয়ত্ব করলে! এমন অঘটন, যা এক শতাব্দীতে হয় না, তাই দেখতে দেখতে ঘটে গেল। একত্র আহার, একত্র বিহার, এক ভাষা, এক পরিধান, একি স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করেছিলুম?

জ্যোতির্ম্ময়—নেতাজী বললেন, আত্মকলহে নিজেদের নিঃশেষ করে ফেলেচ বলে দুর্য্যোগের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ছিলে। আজ

মিলনের শক্তি উদ্‌যাপন করে একবার নিজেকে দেখ দেখি।
সবাই দাঁড়িয়ে দেখলুম ইত্তেহাদের শক্তিতে আমাদের বিরাট পরিবর্ত্তন, কি ছিলুম, কি হয়েছি। হয়ে উঠার নেশা তখন সব ভেদাভেদ ভুলিয়ে দিলে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, সবাই বরণ করে নিল মিলনের বাণী। একত্র আহার, একত্র বিহার, এক ভাষা এক পরিধান, যতবড় ইত্তেহাদ্ ততবড় শক্তি। সে কি অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা।

[আজাদহিন্দ্ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ মেজর মূর্ত্তি ও রাঘবনের প্রবেশ]

মূর্ত্তি ও রাঘবন্—জয়হিন্দ্।

জয় ও জ্যোতি—জয়হিন্দ্।

জয়শ্রী— আসুন, আসুন, আজাদহিন্দ্ ব্যাঙ্কের কুশল তো ?

মূর্ত্তি — শোনাচ্ছে যেন কোনো রকম অসুখ বিসুখ করেছিল।—তার আর বিচিত্র কি ? অসুখ করলেই যখন ঝান্সী বাহিনীর মক্কেল হতে হবে। তা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ব্যাঙ্কের সাড়ে আট কোটি টাকা আয় হয়েচে। তিনটি নূতন শাখা-ব্যাঙ্ক খুলেও কুলিয়ে উঠতে পারচি নে, এত কাজ বেড়েচে।

জ্যোতির্ম্ময়—হুকুমতে আজাদহিন্দ আমাদের কাছে যে রাজস্ব নিচ্ছে তাতেই সাড়ে আট কোটি টাকা হল ? বলেন কি ?

মূর্ত্তি — না, না, ছয় লক্ষ পরিবারের কাছে আট কোটি টাকা রাজস্ব হয় কখনো ? হুকুমতে আজাদ্‌হিন্দের দরিদ্র প্রজারা অত টাকা পাবে কোথায় ?

রাঘবন্ —নেতাজীর নির্দ্দেশে ধনীদের কাছ থেকেই রাজস্ব আদায় হয়। দরিদ্রেরা যা দেয় তাই আমরা নেবার অধিকারী। একমাত্র বিত্তশালী ভারতীয়দের বাঁধা নিরিখে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। সে আর কতটুকু ? যা আদায় হয় তাতে হুকুমতে আজাদহিন্দের

ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরগুলির খরচ কুলিয়ে যায় মাত্র। কিছুই বাঁচে না।

জ্যোতির্ম্ময়—তবে বাকী টাকাটা কি নেতাজীকেই সংগ্রহ করতে হয়?

মূর্ত্তি — হ্যাঁ।

জয়শ্রী — আপনারা তাহলে নেতাজীর পোষ্যপুত্র?

মূর্ত্তি — [হাসিয়া] পোষ্যপুত্রই বটে, কিন্তু নিমক হারাম নই। তিনি যা সংগ্রহ করেন, আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করি।

রাঘবন্—নেতাজী ছাড়া কার সাধ্য বলুন? তিনি আসবার আগে আট কোটি দূরে থাক্, আধকোটি টাকাও পাওয়া যায়নি, পঁচিশলক্ষ হয়েছিল কিনা সন্দেহ। অথচ আজাদহিন্দ্ সঙ্ঘ টাকার জন্য কত ছুটোছুটিই না করেচে!

মূর্ত্তি — যুদ্ধাস্ত্রের যখন আশু প্রয়োজন হল, জাপান অর্থ বিনিময়ে উপযুক্ত যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয় করতে সম্মত হল, তখন নেতাজী নিজে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরোলেন। সভার পর সভা করলেন। নগর থেকে নগরে ছুটে গেলেন। সবাইকে ডেকে বললেন, অর্থ দাও অর্থ দাও, কে আছ কোথায় ভারতবাসী, অর্থ ভিক্ষা দাও। যে শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করচি সে প্রতিদিন বিশকোটি টাকা ব্যয় করচে। অতটাকা তোমরা কোথায় পাবে? তোমরা তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব এনে দাও, যার যা আছে তাই এনে দাও।

রাঘবন্— নেতাজী বললেন, দিকে দিকে টোটেল মবিলাইজেসন্ হচ্ছে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র যুদ্ধরত দেশে সর্ব্বশক্তি সংহত করে দেশের সর্ব্ববিধ ক্ষমতা সংগ্রামে প্রয়োগ করবার আহ্বান উঠেচে। পরিপূর্ণ কুরবাণীর আহ্বান আজ। আজ কি হিসেব করে দেবার দিন? যা আছে দাও। যথা সর্ব্বস্ব দাও। পূর্ব্ব এসিয়ার হিন্দু আজ সন্ন্যাসী হও, পূর্ব্ব এশিয়ার মুসলমান আজ ফকির হও। আটত্রিশ কোটি নরনারীর মুক্তির জন্য তোমরা সর্ব্বস্ব

দান করে সন্ন্যাসী সাজো, ফকির হয়ে যাও। আটত্রিশকোটি নরনারীর দাসত্ব শৃঙ্খল ঘুচিয়ে দেবার চেয়ে বৃহত্তর, মহত্তর সাধনা আর কি আছে? সারা জীবনের সঞ্চিত ধন এই সাধনায় উৎসর্গ কর। যে রাজস্ব দিচ্ছ তাই আজ যথেষ্ট নয়, তোমার উদ্বৃত্ত অর্থটুকুই যথেষ্ট নয়, তোমার যথা সর্ব্বস্ব দেবার দিন আজ। সবটুকু চাই। আজাদহিন্দ্ ফৌজের সেনানী যখন ভারত-সীমান্তে তার বুকের রক্ত উজার করে ঢেলে দেবে, সে কি তখন বলবে আমার রক্তের দশমাংশ দেব, আমার রক্তের পঞ্চমভাগ দেব? তবে তুমি কি করে বলবে তোমার সবটুকু দেব না? তুমি সৈনিক নও?

মৃত্ত — দেখতে দেখতে নেতাজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সব ভাবনা চিন্তা ছাপিয়ে গেল। তারা দেখলে তাদের ভবিষ্যত নেতাজী, তাদের বর্ত্তমান নেতাজী, বুঝি বা অতীত ও। তবে আর ভাবনা কিসের? চারিদিক থেকে টাকাকড়ি, গহনাপত্র, সেভিংস্ ব্যাঙ্কের খাতাটি পর্য্যন্ত নেতাজীর হাতে দেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বৃদ্ধ হবিব সাহেব জনতার পেছন থেকে নেতাজীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। ক্রোরপতি হবিব নেতাজীর কণ্ঠের পুষ্পমাল্য মেগে নিলেন। সেই মালা বুকে চেপে উচ্চকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, আমার যথা সর্ব্বস্ব আমি স্বেচ্ছায় দিলুম। চিরজীবন যা সঞ্চয় করেছি তার এক কপর্দ্দকও আমি আর চাইনে, সব দিলুম। বিনিময়ে নেতাজীর কণ্ঠের মালা আমার হল। আমারই জিত!

রাঘবন্—শ্রীমতী বেতাই তাঁর যথাসর্ব্বস্ব নেতাজীর হাতে এনে দিলেন। এম্নি আরো এলেন। নেতাজী তাদের প্রত্যেককে সেবক এ হিন্দ্ পদক স্বহস্তে পরিয়ে দিলেন। স্বাধীনতা যজ্ঞে যথাসর্ব্বস্ব

দান করে যারা পথে এসে দাঁড়ালেন একমাত্র তারাই পূর্ব্বএশিয়ার সেবক এ হিন্দ্।

দধিচীর বংশধর এঁরা, যুগে যুগে সকলের নমস্য। তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ব্ব এশিয়ার নরনারী একেবারে মেতে উঠল। তারা কেউ নেতাজীকে বললে, আমরা তোমার জন্ম-দিনে সোনার সিংহাসন দেব নেতাজী, রত্নমুকুট দেব, তুমি পরবে। কেউ বললে, আমরা তোমায় সোনা দিয়ে ওজন করব নেতাজী, আমাদের গায়ের গয়না দিয়ে তোমায় ওজন করব, যার যত হীরে মুক্তো আছে সব দিয়ে তোমায় ওজন করব। অর্থের উৎসমুখ খুলে গেল।

জয়শ্রী — এ যেন সব জড়িয়ে একটা অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখছি। একটা বিরাট সত্তার অঙ্গ হয়ে আছি, তার প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছি, কিন্তু তার সমগ্ররূপ দেখা হয় নি। এতবড় তার রূপ যে চোখ ছাপিয়ে যায়। তার বিশাল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাঝে মাঝে দেখতে পাই। তাই নিয়ে সে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। প্রতিবার বিস্ময় অনুভব করি। আর সব চেয়ে বড় বিস্ময় এই বিরাট সত্তা আমা-দেরই সৃষ্টি, আমাদের জন্যই তার সব প্রচেষ্টা, সব আয়োজন। কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ।

জ্যোতির্ম্ময়—ফ্রণ্ট থেকে কদিনের ছুটিতে এসেছি। এসে দেখ্‌ছি কি বিরাট যন্ত্র আমাদের পেছনে থেকে কাজ করচে। হুকুমতে আজাদ-হিন্দের কেন্দ্রস্থলেই উনিশটি দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে, পুরোদমে কাজ করেও কাজ কুলোনো যাচ্ছে না এত দ্রুত কাজ বেড়ে চলেচে। ভারতের যেটুকু আমাদের হাতে আসবে, শত্রু যাবার আগে সেটুকু ধ্বংস স্তূপ করে ফেলে যাবে বলে তাড়াতাড়ি সেই বিধ্বস্ত লোকালয়গুলি পুনর্গঠনের জন্য শিবিরে শিবিরে সহস্র

সহস্র স্বেচ্ছাসেবক বিশেষ শিক্ষায় নিযুক্ত আছে। বিজিত ভূখণ্ড শাসনের জন্য আজাদহিন্দ্ দল তৈরী হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রচার, পূর্ত্ত, অর্থ, যোগান, কত বিভাগে, কত কাজে দশলক্ষের উপর ভারতীয় নরনারী আত্মনিয়োগ করেছে। সব জড়িয়ে অহর্নিশি জেগে আছেন নেতাজী। সর্ব্বত্র তাঁর প্রতিভার নব নব উন্মেষ প্রত্যক্ষ করছি আর মনে মনে বলছি লোকের মনে বিশ্বাস এমনি করেই আনতে হয়, এম্নি করেই বিশ্বাস জাগিয়ে তুল্তে হয়, এম্নি করেই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করে অনুপ্রেরণায় রূপান্তরিত করতে হয়। মাসের পর মাস যাচ্ছে, তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের অন্ত নেই, কোথাও এতটুকু শৈথিল্য নেই। রণক্ষেত্রে যে উন্মাদনা, এখানেও তাই, একতিল কম নয়।

[বালসেনা বাহিনীর ছোট ছোট কটি ছেলেমেয়ের প্রবেশ, বয়স চতুর্দ্দশের অনধিক।]

বালসেনা—জয়হিন্দ্।

জয়শ্রী ও অন্যান্য সকলে—জয়হিন্দ্!

১ম বালসেনা—কাল ভোরবেলা আমাদের প্যারেড্ হবে। আপনারা যাবেন?

জয়শ্রী — নিশ্চয়ই যাব। এখনই যাব। চল, চল।—

২য় বালসেনা—বাঃ এখনই যাবেন কি? কাল ভোরবেলা হবে যে!

জয়শ্রী — ও মা, তাইতো! তা এতক্ষণ আমরা কি করব? উঁহু, আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না, এখনই যাব।

৩য় বালসেনা—বাঃ কাল হবে যে? আমরা বেওনেট চার্জ্জ করব, টার্গেট্ প্র্যাকটিস্ করব, আমরা—বাঃ আজকে যাবেন কি?

জয়শ্রী — বেওনেট্ চার্জ্জ, করবে, বল কি?

৪র্থ বালসেনা—আরো ক-ত-শিখেছি। সব এখন বলব না। আমরা সব জানি। শত্রুকে আমরা ঘায়েল করে দেব।

জয়শ্রী — তোমাদেরও শত্রু আছে নাকি?

৫ম বালসেনা—তাও জানেন না? স্বাধীনতার যারা শত্রু তারাই আমাদের শত্রু। নেতাজী বলেছেন তাদের যুদ্ধ করে তাড়াতে হবে। সেই জন্যই আমরা সকলে বলি, জয়হিন্দ্! নেতাজীর জন্য আমরা সব করতে পারি, প্রাণ দিতে পারি।

জয়শ্রী — তবে তো কালই যেতে হয়। তা তোমাদের গান যদি না শোনাও তবে কিন্তু এখনই যাব।

১ম বালসেনা—আপনি বড্ড ছেলেমানুষ! আচ্ছা, আচ্ছা, গান করচি।

[বালসেনারা মিলিটারি ফরমেশন নিখুঁত ভাবে করিয়া
গাহিল কদম কদম বাড়ায়ে যা,
সকলে সেই গানে যোগ দিল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[ভারত সীমান্তে সুভাষ চন্দ্র ও আজাদ হিন্দ্ সৈন্যদল।]

সুভাষ — ঐ দূরে, ঐ নদী পেরিয়ে, অরণ্য পেরিয়ে, পর্ব্বত উত্তীর্ণ হয়ে' আমাদের স্বর্গ বিরাজ করচে। যে স্বর্গের ধূলিতে আমাদের জন্ম, যে স্বর্গে আমরা অচিরেই পৌঁছুব। শুন্‌তে পাচ্ছ কি ভারত আমাদের ডাক্‌চে? রক্তের টানে, নাড়ীর টানে টান্‌চে? চল, চল আর অযথা বিলম্ব নয়, তরবারি হাতে তুলে লও, শত্রুব্যূহ ভেদ করে, বিধ্বস্ত করে, পথ করে লও। কিম্বা যদি বিধাতার তাই ইচ্ছা হয় তবে বীরের মৃত্যু বরণ কর। সেই পথের ধূলিতে মৃত্যুশয্যা বিছিয়ে দাও যে পথ মুক্তি সেনাকে দিল্লী নিয়ে যাবে। সে পথের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে সে পথকেই শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে চুম্বন কর। দিল্লীর পথ আমাদের মুক্তি তীর্থের পথ। চলো দিল্লী—

সকলে— চলো দিল্লী, চলো দিল্লী।

[ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। কদম কদম বাড়ায়ে যা গাহিতে গাহিতে মার্চ করিতে করিতে সৈন্যদল ষ্টেজ হইতে নির্গত হইতে লাগিল।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[ভারত সীমান্তে ঝান্সী বাহিনীর শিবির]

লক্ষ্মী — এতদিনে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোভাগে এসেছি। সামনে শত্রু দক্ষিণে শত্রু, বামে শত্রু, খুব হুঁসিয়ার! হুকুম না নিয়ে এক পাও শিবিরের বাইরে যাবে না। আমাদের আহার্য্য শেষ হয়ে এসেছে, বস্ত্রের অভাব ঘটেছে, গুলি বারুদ যথেষ্ট নেই। তা হোক্, আমরা এক পাও পিছিয়ে যাব না।

সকলে —নিশ্চয়ই না। কাপুরুষের মত পিছিয়ে যাব না।

লক্ষ্মী — আমাদের সামনে বিশাল অরণ্য। ছোট ছোট পাহাড় ও সরু উপত্যকায় ভরা। পাহাড়গুলির রহস্যভেদ এখন নয়, উপত্যকা-গুলিই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবে। শত্রুর প্যাট্রল নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থান জানতে পায়নি। কিন্তু নারী যোদ্ধা দেখবার জন্য পাহাড়ীগুলো কৌতূহলী হয়ে যে ভাবে দলে দলে আসতে সুরু করেছে তাতে আমাদের অবস্থানটি বেশী দিন শত্রুর অগোচরে রইবে না। পাহাড়ীগুলোর মারাত্মক কৌতূহল নিঃশেষ হবার এখনো কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এখানে তাই থাকা চলবে না, তোমরা ও যুদ্ধের জন্য অধীর হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমাদের যুদ্ধ খণ্ড খণ্ড করে হচ্ছে না, একটা অখণ্ড মহাযুদ্ধ সব মিলিয়ে হচ্ছে বলেই হাইকমাণ্ড থেকে হুকুম না এলে আমরা কিছু করব না। তোমরা ধৈর্য্য ধর।—

১ম — হুকুম কবে আসবে কেপ্টেন্।

২য় — আর কত বসে বসে পায়তারা কষব ?

৩য় — যুদ্ধ তো নয় যেন হুকুম দি কেভ্ম্যানের ঘর করছি।

[গরীলা বার্ত্তাবহের প্রবেশ ও লক্ষ্মীকে মিলিটারি সেলিউট করিয়া পত্র প্রদান। লক্ষ্মী পত্র দেখিতে দেখিতে]

সকলে— হুকুম এসেচে, হুকুম এসেচে।

লক্ষ্মী — হ্যাঁ, হুকুম এসেচে প্রস্তুত হও।

সকলে —[তুমুল উল্লাসে] নেতাজী কি জয়।

লক্ষ্মী — শোন, সামনের পশ্চিম দিগন্তে যে ছোট পাহাড় আবছা দেখা যাচ্ছে, ঐখানে আমাদের দিনে দিনে পৌছুতে হবে। রাত তিনটের সময় রওনা হলে, আমরা কাল সন্ধ্যার পরই সেখানে পৌছুতে পারব। সঙ্গে আলো থাকবে না, টুঁ শব্দটিও করবে না। চুপ চাপ দ্রুত মার্চ্চ করে নিঃশব্দে চলে যেতে হবে। ঐ পাহাড় থেকে ব্রিটিশ শিবির এক মাইল দূরে। ওটা তাদের ভারত সীমান্তের শিবির। সেই শিবিরই আমাদের লক্ষ্য। তোমরা প্রস্তুত হও। চলো দিল্লী—

সকলে —চলো দিল্লী, চলো দিল্লী—

সপ্তম দৃশ্য।

প্রথম পট।

প্যালেল্ অঞ্চলে আজাদহিন্দ সৈন্যদলের শিবির।

[লাউড স্পিকার হাতে লইয়া একজন ও পারে
শত্রুর উদ্দেশ্যে বলিতেছে]

সৈনিক —ও পারের ভারতীয় সৈন্যগণ! আমাদের দলে তোমরা চলে এস। পালিয়ে এস। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কর।

[ও পার হইতে লাউডস্পিকারে জবাব আসিল]

শত্রুসেনা —তোমরা জাপানের গোলাম। তোমরা খেতে পাচ্ছ না। আমাদের দলে চলে এস। আমরা তোমাদের পেট ভরে খেতে দেব।

[এপার হইতে লাউডস্পিকারে]

সৈনিক —আমরা জাপানের গোলাম নই। আমরা আজাদহিন্দ্ সৈন্যদল, আমরা স্বাধীনতার জন্য নেতাজীর অধীনে যুদ্ধ করচি। আর খাওয়ার কথা বলচ? স্বাধীনতার শাকান্ন ও ভাল তবু গোলামীর ঘি, আটা, আমরা চাইনে।

শত্রুসেনা—[ওপার হইতে লাউডস্পিকারে] বহুত আচ্ছা!—

[এপার হইতে লাউডস্পিকারে গান—শরপর তিরঙ্গ ঝাণ্ডা, জালাওয়া দিখা রাখা হ্যায়, ইত্যাদি ঝাণ্ডা সঙ্গীত। ওপার হইতে উদ্দাম করতালির শব্দ। হঠাৎ ওপার হইতে একজন বলিয়া উঠিল]

শত্রুসেনা—এখান থেকে আমাদের সরিয়ে নিচ্ছে। এখানে সাহেব সৈন্য এনেচে।—

১ম সৈনিক—তোমরা শুন্‌লে? ওদের সরিয়ে দিয়ে সাহেব সৈন্য রাখচে পাছে ওরা আমাদের দলে পালিয়ে আসে।

২য় সৈনিক—কতদিন আব আটকাবে ? বেশীর ভাগই তো এসে গেছে, বাকী যারা আছে তাবা ও এসে পড়চে দেখো।

৩য় সৈনিক—উঁহু, এদেব অপেক্ষায় এই জায়গায় পড়ে থাকা আব চল্‌বে না। খাবার যোগাড হচ্ছে না। বনেব বুনো ফলমূল খেযে, লতাপাতা সিদ্ধ আধমুঠো চাল মুখে দিযে দিযে আর পাবা যাচ্ছে না। রুটি সংগ্রহ যেমন কবেই হোক কবতে হবে।

১ম সৈনিক—চল্‌, কমাণ্ডাবকে গিযে বলি।

২য় সৈনিক হ্যাঁ, তাই চল।

৩য় সৈনিক –কিন্তু কমাণ্ডাব যে বললে ও পাহাড়েব জাপানী কমাণ্ডাবেব-কাছে একবেলাব বেশন্ চেযেও পাওযা যায় নি ! ও নাকি বলেচে ওব সৈন্যদেবই যথেষ্ট বেশন নাই।

১ম — তবে কি কবা যায় ?

২য় — চল, কমাণ্ডাবেব সঙ্গে পবামর্শ কবি।

৩য় — হ্যাঁ, তাই চল।

১ম — ঐ যে কমাণ্ডাব আসচে।

[কমাণ্ডাবেব প্রবেশ। সকলে সেলিউট্ কবিল]

কমাণ্ডার—লাউডস্পিকাবেব নূতন খবব কি ?

১ম —ব্রিটিশ কোম্পানি এনেচে।

কমাণ্ডার—হুঁ !—আর কিছু ?

১ম —না।

২য় —খাবার যোগাড় যে করতেই হয় কমাণ্ডাব সাহেব।

কমাণ্ডার—একটু ধৈর্য্য ধর। সামনেই প্যালেলের বিমান ঘাটি। সেটা হস্তগত হলেই প্রচুর খাদ্য মিল্‌বে।

৩য় — তবে সেটা এখনই হস্তগত কবা হোক্।

কমাণ্ডার—তার মানে ?

২য় —তাব মানে হুকুম দাও কমাণ্ডার সাহেব, আমরা এখনই বিমানঘাটি আক্রমণ করি।

কমাণ্ডাব—এখনই ?

সকলে —হ্যাঁ এখনই। তুমি অমত করো না কমাণ্ডার সাহেব।

কমাণ্ডাব—এই দিনের বেলা ? তা হয় না। ব্যাটারা মেসিন্‌গান্ দিয়ে একেবাবে চষে ফেল্‌বে।

১ম — দেখাই যাক্ না!

২য — কে কাকে জাহান্নমে দেয় একবার দেখিই না ?

কমাণ্ডাব—তাই তো!—তোমবা সবাই একমত ? আচ্ছা, জিজ্ঞেস কবে দেখি।—

[বিউগ্‌ল্ বাজাইলেন। সব সৈন্য ছুটিয়া আসিল। সেলিউট্ লইয়া]

তোমবা শোন, এবা কি বলচে।

[সৈন্যবা এক কোণে জড হইয়া কিছুক্ষণ হাত পা নাড়িয়া পবামর্শ কবিল ও ফিরিয়া আসিল]

১ম —আমবা প্রস্তুত কমাণ্ডার সাহেব।

কমাণ্ডাব—উত্তম। আমাদের অবস্থান শত্রু যখন জানেই, তখন আব ক্ষতি কি ?—চলো, অস্ত্র নিয়ে নিঃশব্দে রওয়ানা হও।—

[সকলে ছুটিয়া গিয়া অস্ত্র হাতে লইয়া ফিবিয়া আসিল ও পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল]

পট পরিবর্ত্তণ।

দ্বিতীয় পট।

প্যালেল। ব্রিটিশ বিমান ঘাটি।

কয়েকজন সশস্ত্র সেন্ট্রী ছাড়া অন্যান্য টমিবা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। নেপথ্যে শব্দ হইল—গুড ম, গুড়ুম, গুড় ম—

সেন্ট্রিরা মরিল। কেহ কেহ তারাতারি পজিশন লইল। কেহ কেহ হাতিয়ার আনিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কমাণ্ডেণ্ট আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই আজাদহিন্দ্ সৈন্য বিপুলবেগে খোলা বেওনেট্ ও মর্টর লইয়া আক্রমণ করিল। আধঘণ্টা যুদ্ধ হইল। ক্ষুধার তাড়নায় আজাদহিন্দ্ সৈন্য অত্যন্ত হিংস্রভাবে আক্রমণ করিতেছিল। সেই মরিয়া আক্রমণে আধ ঘণ্টার মধ্যেই বৃটিশ কোম্পানী নিপাত হইল।—

আজাদহিন্দ্ সৈন্য, সকলে—আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ্, আজাদহিন্দ্ জিন্দাবাদ্, নেতাজী কি জয়।

আজাদ কমাণ্ডার—সাবাস্! সাবাস্!!

পেলেল বিমানঘাটি দখল হল। চলো দিল্লী—

আজাদহিন্দ্ সৈন্য সকলে—চলো দিল্লী, চলো দিল্লী—

[উচ্ছাস কিছু কমিলে]

১ম সৈনিক—এবার পেছনের সেই হতভাগা জাপানীগুলোকে নিমন্ত্রণ করব কমাণ্ডার সাহেব? ওরা পেটভরে খাবে?

কমাণ্ডার—[হাসিয়া] আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে!

অষ্টম দৃশ্য

প্রথম পট।

ভারত সীমান্তে ঝান্সী বাহিনী।

লক্ষ্মী —চমৎকার, চমৎকাব, সুন্দর কাজ হয়েচে। শত্রু কিছুই টের পায় নি। এবাব বিশ্রাম কব।

১মা —বাপরে, কি জঙ্গল! যেন শেস হতে চায় না! ছুটে ছুটে পায়ে ব্যথা হয়ে গেল।

২য়া —গা ম্যাজ ম্যাজ করচে।

৩য়া —পা কন্ কন্ করচে।

৪র্থা —উঃ! সুব সুবি দিচ্ছিস্ কেন?

৫মী —ও, ম্যাগো কি বড চ্যালা!

[দুই হাতে মুখ ঢাকিল]

৬ঠী —প্রশংসা পেয়ে আহ্লাদেব রকমটা দেখ না?

[বসিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। সকলের উচ্চহাস্য]

লক্ষ্মী —জলদি কাভাব লও। শত্রু বিমান দেখা যাচ্ছে।

[সকলে ঝোপে ঝাপে ডাল পাতাব অন্তরালে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া নিজেদের উপব ছড়াইয়া দিয়া ক্যামোফ্লাজ কবিতে লাগিল।]

লক্ষ্মী — [শত্রু বিমানগুলি অনেকদূব চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া]

এটেন্‌শন্!

[সকলে উঠিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িযা সাবি বাঁধিয়া দাঁড়াইল]

ঐ সামনেব উপত্যকাব দিকে তাকিয়ে দেখ। ব্রিটিশ সৈন্য শিবিব ছেড়ে বেরিয়েচে। পূবে যাচ্ছে। সব চুপ্! এরা দলে খুব ভারি নয়। হুঁশ হবে। আমরা যদি বাম দিক থেকে এদের

আক্রমণ করি? অতর্কিতে আক্রমণ করে এদের আমরা ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারব বোধ হয়। হুঁ!—চুপ্। ঐ দিকে ঘুরে ওদের বাঁ হাতি মুখ করে আক্রমণ করতে হবে। হাতিয়ার লও। অগ্রসর হও। চুপ্‌চাপ্। শব্দ না হয়।

[হাতিয়ার লইয়া সকলে হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল]

পট পরিবর্ত্তণ

দ্বিতীয় পট।

ব্রিটিশ সৈন্য মার্চ্চ করিয়া যাইতেছে।—

নেপথ্যে লক্ষ্মী—**Fix Bayonet Charge!**

[হুড মুড করিয়া ঝান্সী বাহিনী বামদিক্ হইতে খোলা বেওনেট্ দিয়া দ্রুতবেগে চার্জ্জ করিল। টমিরা প্রথম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল, পরে টাল সামলাইয়া বামদিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। হাতাহাতি যুদ্ধ চলিল। আজাদহিন্দ্ জিন্দাবাদ্ ও লঙ্ লিভ দি কিং পুনঃ পুনঃ শোনা যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে—]

নেপথ্যে তিন দিক হইতে—আজাদহিন্দ্ জিন্দাবাদ্!

ঝান্সী বাহিনী—[তুমুল রবে] আজাদ্‌হিন্দ্ জিন্দাবাদ্। [তিন দিক দিয়া গান্ধী ব্রিগেড্, আজাদ্ ব্রিগেড্, ও জওহর ব্রিগেড্ প্রবেশ করিল।—টমিরা চারদিক দিয়া আক্রান্ত হইয়া সাদা নিশান উড়াইয়া দিল।]

সকলে—[মিলিত গগন ভেদী রবে] আজাদহিন্দ্ জিন্দাবাদ্। নেতাজী কি জয়!

লক্ষ্মী —ব্রিটিশ শিবির চুর্ণ কর, চল, চল।

[মিলিত সৈন্যদল বন্দী টমিগুলিকে নিরস্ত্র করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। একদল অগ্রসর হইয়া শিবির আক্রমণ করিল]

পট পরিবর্তন।

তৃতীয় পট।

অধিকৃত ব্রিটিশ শিবির। ত্রিবর্ণ পতাকা লক্ষ্মী উত্তোলন করিতেছেন।

আজাদহিন্দ সৈন্যগণ—আজাদহিন্দ জিন্দাবাদ! আজাদহিন্দ জিন্দাবাদ!

লক্ষ্মী — ব্রিটিশ শিবির দখল হল। নেতাজী কি জয়।

সকলে — নেতাজী কি জয়! নেতাজী কি জয়!!

[অফিসার পরিবৃত সুভাষচন্দ্র প্রবেশ করিলেন। সকলে সেলিউট করিয়া দাঁড়াইল।]

সুভাষ —এই আমরা ভারতে প্রথম প্রবেশ করলুম। ভারতের মাটির উপর দাঁড়িয়েছি। এই স্মরণীয় মুহূর্তে সকলে ভারতমাতাকে প্রণাম কর।

[সকলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ভারতের ধূলি মাথায় লইল, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। উল্লাসে মুঠি মুঠি ধূলি তুলিয়া চুম্বন করিল ও সারা গায়ে মাখিল।]

সুভাষ — ভারতের ভিতরে মুক্তি ফৌজের জয়ধ্বনি প্রথম বিঘোষিত হল। ভারতবাসী! শুনতে পাচ্ছ কি? ভারতের গগন পবনে এই জয়ধ্বনি রনিয়ে উঠচে কি? ভারতের নরনারী তোমরা চমকে উঠচ কি? আমরা তোমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। তোমরা আশ্বস্ত হও। ধূলি লুণ্ঠিত শির তোল, মাথা উঁচু করে দাঁড়াও।—

সৈনিকগণ! স্বাধীনতার জন্য তোমরা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, কত অভাব অনটনের মধ্যে অবিচলিত দৃঢ়পদে কর্ত্তব্য-সাধনে অগ্রসর হয়েচ। তোমাদের অতুল পরাক্রমে বিধ্বস্ত শত্রু ক্রমেই পিছনে হটে যাচ্ছে। সংখ্যায় অধিক, অস্ত্রবলে বহু প্রবল হয়েও তারা রণে তোমাদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে নি।

তোমাদের কাছে তাদের পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটচে। তোমবা জগতের অভিনন্দন লাভ করেচ, বিজয়লক্ষ্মী ও তোমাদেরই বরণ করুচে। শত্রু তোমাদেব দরিদ্র বলে যে ব্যঙ্গ কবেছিল তার সমুচিত প্রত্যুত্তব তোমবা দিয়েচ। বিপ্লবী সেনা কখনও ধনী হয় না। দুর্ব্বলকে পদানত কবে, তাব বক্ত শোষন কবে, সে স্ফীত হয়ে উঠে নি বলে যারা তাকে অবজ্ঞা করে তারা অন্ধ, তাবা মূঢ। রুশিয়াব বিপ্লবী সেনা ধনী ছিল না। আইয়াবেব বিপ্লবী সেনা দরিদ্রই ছিল। ইটালীব মুক্তি ফৌজ ও দরিদ্রই ছিল। কিন্তু এই দবিদ্র সেনাই যুগে যুগে জয়ী হযেচে, অত্যাচাবীর সব পবাক্রম চিবদিন তাদের কাছে হার মেনেচে, মাথা নত করে পবাজয় স্বীকাব করেচে।—

আজ তোমরা ভারতীয়গণ এক হযেচ। স্বাধীনতা সমবে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, নাবী, পুরুষ, তোমাদেব সকলেব রক্ত এক হয়ে মিশেচে। একত্র আহাব, একত্র বিহাব, একত্র শয়ন, তোমাদের সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েচে। মাংসভোজী, সাত্বিকাহারী, একাহাবী, নিবামিষাশী, উচ্চ, নীচ সকলে এক পংক্তিতে বসে আহার্য্যেব ভাগ নিয়েচ। সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বজাতি সমন্বয়ে ভারতেব মহামানব তোমাদেব একাগ্র নিষ্ঠায় গড়ে উঠেচে। ভারতের মণীষীগণের যুগ যুগব্যাপী স্বপ্ন আজ তোমরা সফল করেচ। আজ ভাবতেব মাটিতে দাঁড়িয়ে ভগবানের নামে এই শপথ কর দুর্দ্দিনের অগ্নি পবীক্ষায় বিশুদ্ধ হযে তোমাদেব মধ্যে ভারতের যে মহামানব জন্ম নিয়েচে তাকে তোমরা চিবদিন বাঁচিয়ে রাখবে, সেই মহামূল্য রত্ন অক্ষয় কবচের মত বুকে ধারণ করবে।—আজ মুক্তকণ্ঠে বলো জয়হিন্দ্। আজ আর মাঝখানে

কেউ দাঁড়িয়ে নেই, বলো জয়হিন্দ্। আজ নিজের দেশে, নিজের আকাশে, নিজের বাতাসে প্রাণ খুলে বলো, জয়হিন্দ্।

সকলে—[গগণভেদী রবে] জয়হিন্দ্, জয়হিন্দ্!

সুভাষ — চলো দিল্লী—

সকলে— চলো দিল্লী, চলো দিল্লী।—

[ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। কদম কদম বাড়ায়ে যা—গাহিতে গাহিতে মার্চ্চ করিয়া ষ্টেজ দিয়া নির্গমন।]

নবম দৃশ্য

বার্ম্মায় আজাদহিন্দ ফৌজের হেড্ কোয়ার্টার্স।

সুভাষ — অর্ডার অব্ দি ডে তৈরী হয়েছে ?

কাদের — হাঁা, নেতাজী।

সুভাষ — পড়।

কাদের — [পাঠ করিল] কোহিমা অধিকৃত হয়েচে। কালাদান অঞ্চলে শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। টিড্ডিম ও প্যালেল অঞ্চলে আমরা শত্রুর আরো দুটি বিমানঘাটি দখল করে পূর্ণবেগে এগিয়ে যাচ্ছি। আরাকান ও হাকা অঞ্চলে শত্রুর গতিরোধ করেচি। আজাদহিন্দ্ দল অধিকৃত অঞ্চলে মেজর জেনেরেল চ্যাটার্জ্জীর অধীনে শাসন ও পুনর্গঠনের কাজ নিপুণ ভাবে সম্পন্ন করে হুকুমতে আজাদহিন্দের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করেচে। আজাদহিন্দ্ জিন্দাবাদ।

সুভাষ — ঠিক হয়েচে। [স্বাক্ষর করিলেন।]

শিবিরে শিবিরে রেডিও করে দাও। প্রচার বিভাগে কপি পাঠাও।—

কোহিমা অধিকৃত হয়েচে। ইউনিয়ন জ্যাক্এর গর্ব্বোদ্ধত শির ধুলায় লুণ্ঠিত করে ত্রিবর্ণ পতাকা সগর্বে আকাশচুম্বী শির কোহিমার গগনে তুলে ধরেচে। এবার ইম্ফল।—মণিপুর ও আসাম ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হচ্ছে। দিল্লী ক্রমেই কাছে আস্‌চে।—শত্রুর যে সব কাগজপত্র আমাদের হাতে পড়েচে তাতে জানলুম ইম্ফলে তারা শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত লড়বে। ইম্ফলের পর কলকাতার আগে আর তাদের দাঁড়াবার স্থান নেই। কলকাতা

[কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। যেন মানস নেত্রে দূরের কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন।]

জানিনে, শত্রু অধিকৃত, দুর্ভিক্ষ পীড়িত কলকাতা আজ কেমন আছে, কি ভাবে আছে। [দীর্ঘশ্বাস মোচন]—
কতবার শিলঙ্ গিয়েছি। তারপব সিলেট। কত পবিচিত মুখ চোখে ভাস্‌চে, কত পবিচিত দৃশ্য, কত কাহিনী কত তুচ্ছ কথা। আমি জানি তারা আমাকে ভোলেনি। রেডিওতে আমার কণ্ঠস্বব তাবা চিন্‌তে ভুল কবেনি, নিশ্চয়ই না। আজ আমরা কত কাছাকাছি। আমি আর দূরের কণ্ঠস্বর হয়েই থাক্‌বো না। আমাব বাহু শীঘ্রই তোমাদের আলিঙ্গন কববে, মিলনেব দিন কাছে এসেচে। নির্ঝবেব বেগে পূর্ব্ব গিরিশৃঙ্গ হতে স্বাধীনতাব জাহ্নবীধাবা নেমে আস্‌বে। দিল্লীর পথে শত সহস্র শাখা নদী তাব দেহে মিশে যাবে। প্লাবনেব বেগে সেই সহস্রশিব নাগিনী মুক্তিজাহ্নবী পথেব বাধা ভাসিয়ে দেবে, ডুবিয়ে দেবে, নিশ্চিহ্ন কবে দেবে। কাব সাধ্য তাব গতি বোধ কবে ?
ইম্‌ফল কেড়ে নিতে হবে। সব শক্তি ইম্‌ফলে কেন্দ্রীভূত কব। ইম্‌ফলেব উপর জয় পরাজয় নির্ভর কবচে। ভারতযুদ্ধেব ভাগ্য নির্ণয় হবে ইম্‌ফালে। বুঝতে পারচ না? ইম্‌ফাল আমাদেব হাতে এলে শত্রুব তৈবী চওড়া রাস্তাগুলো দিয়ে আমাদেব মিকোনইজড্ বাহিনী দ্রুতবেগে কলকাতাব বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে, শত্রু আব অবকাশ পাবে না। তখন তিনদিক দিয়ে কলকাতা আক্রান্ত হবে। আসামের পথে আমরা, চট্টগ্রামের পথে মিত্র জাপান, ও ভিতর থেকে অন্তর্বিপ্লব। মহাকালের এই ত্রিশূল শত্রুব বুক লক্ষ্য কবে উদ্যত হবে। কলকাতা যেদিন কেড়ে নেব সেদিন বিজয়োৎসব আব দূবে রইবে না।—
ইমফালের চারদিকে পূর্ণবেগে আক্রমণ চালিয়ে যাও। ইমফাল্‌কে

ঘিরে ফেল। তারপর অবরুদ্ধ ইম্‌ফালে একবার সর্ব্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়। ইম্‌ফাল টীকেন্দ্রজিতের দেশ। মুক্তিফৌজ টীকেন্দ্রজিতের দেশে নির্ব্বান্ধব নয়।—ইম্‌ফাল জয়ের গুরুত্ব আজাদহিন্দ্ সৈনিকদের জনে জনে বুঝিয়ে দাও।

জ্যোতির্ম্ময়— নেতাজী।

সুভাষ—বল।

জ্যোতির্ম্ময়—আমি বলছিলুম কি, সম্মুখ যুদ্ধের আগে,—

সুভাষ—হ্যাঁ বল, বল।

জ্যোতির্ম্ময়—ইম্‌ফালের বারুদ ডিপোর অবস্থানটা—

সুভাস — ওদের এ্যামুনিশ্যন্ ডাম্প্ কোথায় তাই জানতে চাও? কেন?

জ্যোতির্ম্ময়—আমি বলছিলুম, ওগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিলেই তো ওরা জব্দ হয়ে যাবে।

সুভাষ — ওগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিলে? ও! তুমি সুইসাইড্ স্কোয়াড্ গড়তে চাও? মৃত্যুব্রতী সেনা?

জ্যোতির্ম্ময়—হ্যাঁ, নেতাজী, অনুমতি করুন, আমি শত্রুরগুলি বারুদের স্তুপ ধ্বংস করে দিতে চাই।

লক্ষ্মী — নেতাজী!

সুভাষ — তুমি ও মৃত্যুব্রতী হতে চাও?

লক্ষ্মী — আদেশ দাও নেতাজী, শত্রুর জল সরবরাহের পথ আমি বন্ধ করে দিতে চাই।

মালেক—ওদের পেট্রল আমি জ্বালিয়ে দিতে চাই।

নায়াব—ওদের রসদ আমি নষ্ট করে দিতে চাই।

সুভাষ — না, না, আহার্য্য নষ্ট করা হবে না। তোমরা মৃত্যুব্রতী হতে চাও?

সকলে — হ্যাঁ, চাই, চাই, নেতাজী!

সুভাষ — ভাল করে ভেবে দেখ। রক্তক্ষুধাতুরা মুক্তিদেবী রক্ত চায়। অপার রক্তক্ষুধায় লেলিহান দীর্ঘরসনা মেলে চেয়ে আছে সে। রক্তেই সে প্রসন্ন হয়। নরমেধ যজ্ঞেরও কি প্রয়োজন ?

লক্ষ্মী — একটি সৈনিকের বিনিময়ে সহস্র সৈন্যের প্রাণরক্ষা হবে নেতাজী।—

জ্যোতির্ময়—ইম্‌ফালের পথ সুগম হয়ে যাবে নেতাজী।

মালেক—একটি সেনার কুরবানীতে কলকাতার পথ খুলে যাবে নেতাজী।

সকলে—অনুমতি করন নেতাজী।

সুভাষ —তাই হোক্। তবে তাই হোক্।—

রাজস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী একদিন ম্যয় ভূখা হুঁ বলে সম্রাটের কাছে রক্ততৃষ্ণা জানিয়েছিলেন। ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আজ ম্যয় ভূখা হুঁ বলে হাত পেতে দাঁড়িয়েছেন। দেব, দেব রক্তক্ষুধাতুরা দেবী। দেহ মন প্রাণ সব নিঙ্‌ড়ে রক্ত দেব, তুমি প্রসন্ন হও, তৃপ্ত হও।—

এস মৃত্যুব্রতী সেনা! নিজের দেহরক্তে তোমার মৃত্যুব্রত অঙ্গীকার কর। এস, মুক্তির বেদীমূলে কে মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের লগ্ন নিরূপণ করতে চাও। এস, নিজের রক্ত দিয়ে নাম স্বাক্ষর কর।

[লক্ষ্মী অগ্রসর হইয়া আসিলেন। দক্ষিণ হস্তে নিজের বাম করাঙ্গুলি ছেদন করিয়া সেই রক্তে নিজের নাম স্বাক্ষর করিলেন। নবনারী একে একে আসিয়া অঙ্গুলী কাটিয়া রক্তের স্বাক্ষর করিতে লাগিল।]

ধন্য বীর প্রসবিনী, ধন্য ভারতজননী। এমন সন্তান যার তার কি ধূলায় আসন সাজে ? উঠ, উঠ মা, চেয়ে দেখ, ইম্‌ফাল

প্রকম্পিত করে, ভারতশত্রুর বুক কাঁপিয়ে মৃত্যুব্রতী বাহিনী অবতীর্ণ হল। মৃত্যুগঙ্গার এল ভগীরথ। এবার লহবে লহরে রক্তস্রোত ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রবাহিত হবে। ভারতশত্রু! সেই উর্ম্মি গর্জ্জন কান পেতে শোন। এখনও সময় আছে, সম্মুখ থেকে সরে দাঁড়াও। নইলে, অভিশপ্ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।—

এস মৃত্যুব্রতী, মৃত্যুযজ্ঞের কর উদ্বোধন। বলো, বন্দেমাতরম্।

সকলে—বন্দেমাতরম্।

[ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, সঙ্গীত হইল বন্দেমাতরম্।]

দশম দৃশ্য

কোহিমা। ফিল্ড্ হাস্পাতাল।

দূরে বিষেণপুরের যুদ্ধ হইতেছে। শত্রুপক্ষে গুর্খা রেজিমেণ্ট্ ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। আজাদহিন্দ্ সৈন্য বিপুলবিক্রমে আক্রমণ করিতেছে। দুইপক্ষের আর্টিলারি ঘন ঘন অগ্ন্যুদ্গার করিতেছে। সেই ভীষণ যুদ্ধের কামান নির্ঘোষ থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলিয়া কোহিমার হাসপাতালেও পৌছিতেছে। মাঝে মাঝে সমগ্র কোহিমা কাঁপিয়া উঠিতেছে।

লেফ্টেনেণ্ট্ কর্ণেল লক্ষ্মী ও নার্সবেশে জয়শ্রী। ছোট্ট কট্ এ জ্যোতির্ম্ময় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। অপারেশন হইয়া গিয়াছে। বুকে, পিঠে ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

জয়শ্রী — ওগো, অমন করে কে তোমায় মারলে গো? আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে। একবার তাকাও, তোমার এত আদরের শ্রীকে একবার কাছে টেনে নাও। আমার বীর! আমার প্রিয়তম! তোমার শ্রীকে কার কাছে রেখে যাও? আমি বাঁচব কি করে? একবার কথা কও। একবার ডাকো শ্রী বলে। ও হো হো গো।

লক্ষ্মী — [জয়শ্রীকে বুকে চাপিয়া, অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া] অধীর হয়ো না জয়শ্রী। তোমার স্বামী অজ্ঞান হয়ে আছেন। ঈথর দেওয়া হয়েছিল, একটু পরেই ঈথরটা কেটে যাবে। কথা বলবেন বৈকি। তুমি একটু স্থির হও। যতক্ষণ জ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ আমি এখানে থাক্‌ব। ভয় কি?

[এম্বুলেন্স গাডী আরও আহত সৈন্য লইয়া আসিল। লক্ষ্মী উঠিলেন।]

লক্ষ্মী — আমি এখুনই আস্‌চি। কোন ভয় নেই। আহতদের ব্যবস্থা গুলো একটু দেখে আসি, অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী এসেচে।

জয়শ্রী — আমার নয়নমণি। একটিবার তাকিয়ে দেখ, দেখ না গো!— বড্ড লেগেচে, না, আহা! [মুখ চুম্বন করিলেন।] সব সেরে যাবে একটু ঘুমোও। আমি তোমায় পাখা করি। এবার সেরে উঠলে আমি তোমায় দূরে অনেক দূরে, নিয়ে চলে যাব। আর এ ভয়ঙ্কর দেশে থাক্‌ব না। তোমাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখব, সব কিছু থেকে আড়াল করে রাখব, আর ছেড়ে দেব না।—

[শত্রুবিমান হাসপাতালের খুব কাছে বোমা নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল]

জ্যোতির্ম্ময়—[বিছানায় অর্দ্ধোত্থিত হইয়া জয়শ্রীর হাত ধরিল] কি ওটা? ওটা কি?

জয়শ্রী — [আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল। মুখে ওঃ মাগো! বলিয়াই তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া লইল।]

ও কিছু নয় গো তুমি ঘুমোও। বিষেণপুরের যুদ্ধ হচ্ছে কিনা। গুর্খাগুলো কামান দাগ্‌চে আর কি।

জ্যোতির্ম্ময়—[ক্ষীণস্বরে] শ্রী?

জয়শ্রী — [চক্ষু মুছিয়া] এই যে আমি। এই যে তোমার শ্রী। কিছু এনে দেব?

জ্যোতির্ম্ময় — আমি কোথায়?

জয়শ্রী — তুমি কোহিমার হাসপাতালে আছ। যুদ্ধে আহত হয়েছিলে।

জ্যোতির্ম্ময়—ও, মনে পড়েচে। আমরা পেট্রোল ড্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলুম। [শিহরিয়া উঠিল। জয়শ্রী তাহাকে অতি সন্তর্পণে বুকে জড়াইয়া ধরিল।]

জয়শ্রী — তুমি কথা কয়ো না একটু চুপ করে শুয়ে থাক।

জ্যোতির্ম্ময—[নিজের মনে] এখনও কামান ছাড়চে ?—হ্যাঁ এক রেজিমেণ্ট গুর্খা, একটু সময় লাগে বৈকি ! হতভাগারা কেন যে যুদ্ধ করে মরচে !

[লক্ষ্মীর প্রবেশ]

লক্ষ্মী — মেজর জ্যোতির্ম্ময় ! বড কষ্ট হচ্ছে কি ?

জ্যোতির্ম্ময়—[ক্ষীণ হাসিয়া] বুঝতেই তো পাচ্ছেন !

[লক্ষ্মী নাড়ী ধরিয়া বসিলেন]

আচ্ছা কর্ণেল লক্ষ্মী, পেট্রল ডাম্প্‌টা আমরা শেষ করে দিয়েছিলুম, ওরা তবে এখনও লডচে কি করে ?

লক্ষ্মী — ওদের মিকানাইজড্‌ দলটা পঙ্গু হয়ে গেছে। অন্যরা যুদ্ধ করচে।

জ্যোতির্ম্ময়—হাতাহাতি যুদ্ধ ?

লক্ষ্মী — [ষ্টেথোস্কোপ্‌ লইয়া বুক পরীক্ষা করিতে করিতে] হ্যাঁ। আর্টিলারি ও আছে। ওদের বিমানকে আমরা তিন হাজার ফুট উপরে এন্‌গেজ্‌ করে রেখেচি। বিমান দিয়ে যে সব সাপ্লাই ওদের আস্‌ত তা এখন বন্ধ হয়েচে। আর দশ বারো ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ওদের কাবু করে ফেল্‌ব। আপনি তো জানেনই রাস্তাঘাট সব এখন আমাদের হাতে।

[জয়শ্রীকে] দুধ খেয়েচেন ?

জয়শ্রী — না।

লক্ষ্মী — এস।

[যাইতে যাইতে চুপি চুপি] বোমার শকটা সাম্‌লে নিলেন কি করে ? পাঁচজন এই শকএ মারা গেছে। বোমাটা বাগানে পড়েছিল। আমাদের ষ্টোর এর কিছু ক্ষতি হয়েছে, আর কিছু হয় নি।—ওঁকে কি বলেচ ?

জয়শ্রী — বলেচি বিবেনপুরের কামানের শব্দ।

লক্ষ্মী — ব্রেভ্ মেয়ে। বেশ করেচ।—এখন শুধু সেবা আর মুখের হাসি চাই, বুঝ লে? আর কোন ভয় নেই।

[উভয়ের প্রস্থান]

জ্যোতির্ম্ময়—নেতাজী তোমার গতিরোধ কে করতে পারে? অপ্রতিহত তোমার জয় যাত্রা। ব্যাণ্ড বাজ্ছিল কদম কদম বাড়ায়ে যা। ত্রিবর্ণ পতাকা গর্ব্বভরে আকাশের গায়ে মাথা তুলেছিল। মৃত্যুও তাকে হস্তচ্যুত করতে পারে নি। আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলুম। পথের ধারে রক্তাক্ত দেহে কারা পড়েছিল, বললে, থেমো না, চলে যাও, আমাদের জন্য ভেবো না, চলো দিল্লী। আমার চোখের সামনে নেতাজীর নাম মুখে নিয়ে কত সহীদ্ হাসি মুখে প্রাণ দিয়ে গেল। মৃত্যুকালে তারা ইষ্টনাম ভুলে গিয়ে তোমাকেই স্মরণ করেচে নেতাজী। যন্ত্রণাকাতর মুখে কি স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলেচে নেতাজী কি জয়!—

[জয়শ্রীর প্রবেশ]

জয়শ্রী — [ফিডিং কাপ্ এ দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে] তোমার জন্য ফুল আনতে বলে দিলুম।

জ্যোতির্ম্ময়—যাও না, নিজে তুলে আনো। আমি পালাব না। কাছে বাগান নেই? কোহিমা ফুলে ভরা ছিল দেখেছিলুম।

জয়শ্রী — [বাগানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে বোমার আঘাতে সব ফুল ঝলসাইয়া গিয়াছে।] বাঃ, ঐ ফুল বুঝি? তোমার জন্য মার্শেল নীল আনতে পাঠালুম। তুমি কত ভালবাসো। কতদিন খোঁপায় পরিয়ে দিয়েচ, মনে নেই?

জ্যোতির্ম্ময়—[স্মিতহাস্যে] হ্যাঁ, শ্রী। মার্শেল নীলের সেই লতাটা! এখন

আর নেই বোধ হয়। ভা-রি আদুরে লতা, এতটুকু অবহেলা তার সয় না।

[কোহিমা কাঁপাইয়া বিষেণপুরের কামান জলদ গম্ভীর শব্দ করিল]

ওদের কামান একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েচে। আগের বার যা শব্দ করেছিল, এখন যেন অনেক কম।

জয়শ্রী — ওদের কামান বুঝি? ওতো আমাদের কামান।

জ্যোতির্ম্ময়—না, শ্রী, কামানগুলো ওদের। আমরা বড় কামান আনতে পারি নি। আমাদের লাইট ট্যাঙ্কগুলো এসেচে। তাদের শব্দ এমন নয়।

জয়শ্রী — কিছু জানো না। আমাদের কামান এসেচে, বাজি রাখো।

জ্যোতির্ম্ময়—আচ্ছা, বাজী। কি দেবে?

জয়শ্রী — বিষেণপুরের যুদ্ধে জয় হলে সর্ব্ব প্রথম সংবাদটা তোমায় এনে দেব। আর তুমি?

জ্যোতির্ম্ময় - বিষেণপুরের যুদ্ধে আমরা কখনো হারব না শ্রী। জয়ের সংবাদ তুমি আনবেই। কাজেই তোমার হার হল।

জয়শ্রী — এই বুঝি? তুমি কি দেবে?

জ্যোতির্ম্ময়—মুক্তোর নেকলেট্ দেব, হীরের পেণ্ড্যাণ্ট দিয়ে। সব খুলে দিয়ে দিয়েচ, কেমন খালি খালি লাগে।

জয়শ্রী — না গো, তোমার জন্য আমি রোজ ফুলের গয়না পরব। তখন আর খালি লাগবে না। উপস্থিত নিজেই পরব, কিন্তু সেরে উঠে তুমি নিজের হাতে পরিয়ে দেবে।

জ্যোতির্ম্ময়—দেব, শ্রী, নিজের হাতে পরিয়ে না দিয়ে আমিই কি পারব? কিন্তু আমি কথায় ভুলি নে। পরিশ্রমটা যে করব তার অগ্রিম কিছু দিতে হবে।

জয়শ্রী — [আরক্ত হইয়া] যাঃ ও।—না, না, এখনই কেউ দেখে ফেলবে।

জ্যোতির্ম্ময়—তবে আমি আদায় করব। এই উঠলুম!—

জয়শ্রী — না, না, পায়ে পড়ি, তুমি উঠো না। আচ্ছা, একবার, শুধু একবার, প্রতিজ্ঞা কর।

জ্যোতির্ম্ময়—আচ্ছা।

[জয়শ্রী খুব সন্তর্পণে বুকে বুক রাখিল ও মুখ তুলিয়া ধরিল। জ্যোতির্ম্ময় সেই মুখও অর্দ্ধনিমীলিত চোখ প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল]

কি সুন্দর তুমি? আমায় কত ভালবাসো তুমি। শ্রী আগের জীবনে তোমায় সত্যি করে পাই নি। আজ পেয়ে যেন সে কথা বুঝলুম। নারী বীরকে যেমন সব দিয়ে পূজো করে, কাপুরুষকে তেমনি ঘৃণা করে। পুরুষ যেন তার বুকের রক্ত দিয়ে নারীর গোপন রক্তকমলটি ফুটিয়ে তোলে। আমি বুকের রক্ত দিয়েচি, তাই তো তুমি ফুটে উঠেচ শ্রী। আরো দেব, আরো রক্ত দেব, সহস্রদল মেলে দিয়ে কি অপূর্ব্ব পরিমল গন্ধে তুমি পূর্ণ বিকশিত হবে তারই লোভে আমি বুক উজাড় করে রক্ত ঢেলে দেব।

জয়শ্রী — প্রিয়তম! আমার বীর! কি কথা শোনাও? আমার বুক কাঁপে। সব বুঝিনে, বুঝতে চাই নে। শুধু মনে হয় সারা যুগ ধরে ওই সুধাকণ্ঠ আমার কাণে কাণে কথা কয়ে যাক্। ওই বাণী আমায় সব ভুলিয়ে সুধা সাগরে ডুবিয়ে রাখুক।—

[কিছুক্ষণ দুই জনে মগ্ন হইয়া রহিল]

জ্যোতির্ম্ময়--[সহসা] দেখি, দেখি?—

[জয়শ্রীর বাম করাঙ্গুলী চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল। তাড়াতাড়ি অঙ্গুলিটী লুকাইয়া ফেলিল।]

শ্রী! তুমি? তুমিও মৃত্যুব্রতী হয়েচ? কই আমাকে তো কিছুই বলো নি!—

[জয়শ্রী জ্যোতির্ম্ময়ের বুকে মুখ ঢাকিল। জ্যোতির্ম্ময় জোর করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল।]

তোমায় দেখি, আব একটু দেখি শ্রী। এত সুখ যিনি আমার জন্য রেখেছিলেন, এসো আজ তাঁকে একসঙ্গে প্রণাম করি।

[উভয়ে যুক্ত করে ভগবানকে প্রণাম কবিল]

যিনি এই পথে হাত ধরে আমাদের নিয়ে এলেন, এসো সেই নেতাজীকে প্রণাম কবি।

[উভয়ে যুক্ত কবে নেতাজীব উদ্দেশে প্রণাম করিল]

এবাব বলো মৃত্যুব্রতীর মন্ত্র, তুম্, হাম্‌কো খুন্ দো, ম্যায় তোম্‌কো আজাদি দুঙ্গা।

দুজনে মুখেব কাছে মুখ আনিয়া একসঙ্গে আবৃত্তি করিল]

তুম্ হামকো খুন্ দো, ম্যায় তোম্‌কো আজাদি দুঙ্গা।

তুম্ হাম্‌কো খুন দো, ম্যায় তোম্‌কো আজাদি দুঙ্গা।

যেন তাহাবই জবাব আসিল, দূব হইতে জলদমন্দ্রে ধ্বনিত হইল, আজাদহিন্দ্ জিন্দাবাদ্, আজাদ্‌হিন্দ্ জিন্দাবাদ্]

একাদশ দৃশ্য

প্রথম পট্।

ইম্‌ফালে অদূরে আজাদহিন্দ্‌ বাহিনীর শিবির।

১ম অফিসার—বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টির বিরাম আর নেই। আজ সাত দিন ধরে অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ের বুক অবধি জল দাঁড়িয়েচে। এদিকে পাহাড় ধ্বসে পড়চে, ওদিকে বড় বড় গাছ ধরাশায়ী হচ্ছে। কিছু বা ভেসে যাচ্ছে, কিছু বা স্তুপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। কোথাথেকে গম্বুজের মত বড় বড় পাথর হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়েচ। পথঘাট নিশ্চিহ্ন হয়েচে। সৈন্যেরা ক্ষেপেচে নাকি? ওরা কি সাঁতার কেটে ইম্‌ফাল চড়াও হবে নাকি?

২য় অফিসার—সৈন্যরা বলচে, নেতাজীর হুকুম দিল্লী চলো। আমরা দিল্লীর দিকেই যাব। কেউ বলচে, আমরা এগিয়ে চল্‌তেই শিখেচি, পিছিয়ে যাওয়া জানি নে। কেউ বল্‌চে, পিছিয়ে যাবার হুকুম কে দেয় আমরা দেখব, সে যে বিশ্বাসঘাতক নয় তার প্রমাণ কি?

১ম অফিসার—কমাণ্ডার কি বললে?

২য় অফিসার—বললে, বাপ্‌রে বাপ। আমি তো কিছুই বলচিনে। হাইকমাণ্ডের হুকুম যা এসেচে তাই তোমাদের জানালুম। বিশ্বাস-ঘাতক কথাটা কানে শুনিওনা, এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।—আর, ট্যাঙ্কগুলো যেন কাঁধে করে ইমফাল নেবার চেষ্টা করো না।

১ম অফিসার নেতাজী না এলে এদের কেউ এখন সামলাতে পারবে না। ইমফাল আক্রমণের জন্য এরা মরিয়া হয়ে উঠেচে।

২য় অফিসার—চল, দেখি নেতাজীর হুকুম এল কি না।

পট পরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় পট

আজাদহিন্দ বাহিনীর অন্য শিবির।

১ম সৈনিক—আমরা মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকব। ইন্‌ফালেব যুদ্ধ না করে আমবা এক পাও নড়ব না।

২য় সৈনিক—বৃষ্টিতে আমাদেয় কি কববে? আমবা সব সইতে প্রস্তুত।—

৩য় সৈনিক—বৃষ্টি থামচে না বলে আমাদেব পিছিয়ে যেতে হবে এ কেমন কথা? ইম্‌ফালের যুদ্ধে আমাদের ভাগ্য নির্ণয় হবে। কাঙ্‌লা তুম্বী বিষেণপুরে শত্রুর শিবিব ধ্বংস হল। ইম্‌ফাল এখন চার-দিক থেকে পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পডেচে, শত্রুর সঙ্গে ইম্‌ফালেব আব এতটুকু যোগ নেই। এখন কি কালক্ষেপ কববাব সময়?

৪র্থ সৈনিক—এখন কি বিলম্ব করা উচিত? কমাণ্ডাব যদি ভয় পেয়ে থাকে তবে সে ফিরে যাক্, আমবা যাব না।

সকলে —কিছুতেই না।

৫ম সৈনিক - নেতাজীর হুকুম ছাড়া আমবা এক পাও নডব না।

পট পবিবর্ত্তন।

তৃতীয় পট।

আজাদহিন্দ্ বাহিনীব তৃতীয় শিবির।

কমাণ্ডাব—তাই তো। ওদেব বিমান ঝাঁকে ঝাঁকে আস্‌চে, আমাদেব বিমান দেখা যায় না কেন? আজ সাতদিন ধরে সব সরবরাহ বন্ধ হয়ে আছে। আহার্য্য শেষ হয়ে এল। হাইকমাণ্ড পিছিয়ে যাবাব হুকুম দিয়েচে। সৈন্যরা কিছুতেই পিছিয়ে যাবে না বলচে। এখন কি করি? নেতাজীব হুকুম না এলে এদের নড়ানো যাবে না। অথচ এমনভাবে বসে থাকলে শত্রু বোমারুর হাতে মৃত্যু অনিবার্য্য। আমাদের বিমানগুলো গেল

কোথায় ? বিমান নেই, সরবরাহ বন্ধ, এমন তো কখনো হয় নি। একটা কিছু ঘটেচে নিশ্চয়ই। কি ঘটল ?—ইম্‌ফালে অল্-আউট্ যুদ্ধ সুরু হবে, সব ঠিক, কাঙ্‌লাতুম্বী ও বিষেণপুরে শত্রুর শেষ দুটো শিবির দখল হয়ে গেছে, ইম্‌ফালের সব সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েচি, কেনোরকম সাহায্য আসবার কোনো পথ রাখি নি, অথচ হাইকমাণ্ড পিছিয়ে যাবার হুকুম দিলে। আমার যেন কেমন কেমন ঠেকচে। ঠিক বুঝতে পারচি নে।—নেতাজীর হুকুম কখন আসবে।

পট পরিবর্ত্তন।

চতুর্থ পট

আজাদহিন্দ্ ফৌজের হাইকমাণ্ড।

সকলে ম্লানমুখে নতশিরে বসিয়া আছেন। সুভাষচন্দ্র এদিক হইতে ওদিকে পায়চারি করিতেছেন।

সুভাষ — একি হল ! দেখতে দেখতে আঁধার ছেয়ে এল। ইম্‌ফালের সম্মুখ যুদ্ধ প্রবল বৃষ্টির মুখে স্থগিত হয়ে গেল। কে জানত, এই অভিশপ্ত বর্ষনের মুখে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজটিও সেই সঙ্গে ভেসে যাবে ?, একি দুঃস্বপ্ন ? না, এ সত্যসত্যই দেখচি ?—শিবিরে শিবিরে নির্ভিক সৈনিক ইম্‌ফাল আক্রমণের হুকুম অপেক্ষা করচে। অধীর হয়ে, অস্থির হয়ে, ক্ষেপে যেতে যেতেও তারা হুকুমের অপেক্ষায় মুহূর্ত্ত গুন্‌চে। কি করে তাদের বলব যে সে হুকুম আর আস্‌বে না ? কি করে বলব যে তাদের নেতাজী আজ বিকল, বিভ্রান্ত হয়ে অন্ধকারে পথ খুজে পাচ্ছে না ? কি করে বোঝাব যে তাদের নেতাজী সব অসাধ্যই সাধন করবার মন্ত্র জানে না ?

আমেরিকার প্রবলতম বাহিনী জলপথে জাপান আক্রমণ

করেচে। মেক্ আর্থাব ক্রুদ্ধ হনুব বেগে লাফিয়ে লাফিয়ে দ্বীপেব পব দ্বীপ অতিক্রম কবে দ্রুতবেগে জাপানের দিকে ছুটে আসচে, তাকে কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না। জাপানে সামাল সামাল বব উঠেচে। ইউরোপ থেকে বিজয়ী বাহিনী দলে দলে পূর্ব্ব-এশিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়চে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমেরিকা ও ব্রিটেনেব হিংস্র গর্জ্জন কর্ণ বধির করে দিচ্ছে। রুশিয়া জাপানেব সঙ্গে মিত্রতা বন্ধন ছিন্ন কবেচে। যেন যাদুমন্ত্রে ব্রহ্মদেশ হতে জাপানী সেনা অন্তর্হিত হয়েচে। জাপানের সব যান বাহন, যুদ্ধাস্ত্র সম্ভাব, সব কিছু সেই সঙ্গে কোথায় চলে গেছে। পথ খোলা পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুর বিমান আমাদের কেন্দ্রগুলি বিধ্বস্ত বরচে, সববরাহ রাস্তা নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে, যান বাহন নির্ম্মুল করচে। সৈন্যরা চাবদিক দিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পডচে। এখন পিছিয়ে না এলে মৃত্যু অনিবার্য্য। ইম্ফাল! এম্নি কবে আমাব চির জীবনেব সাধনা বিফল করে দিলে? অশ্রুজলে, কত দুঃখে, কত নির্য্যাতন সয়ে আজন্ম কঠিন তপস্যায় যে বিবাট মুক্তি যজ্ঞ উদ্‌যাপিত হল তোমার কঠিন দুয়াব সেই যজ্ঞেব পানেও উন্মুক্ত হল না, তোমার রুদ্ধদ্বাব খুলল না। এত আশা, এত উদ্যম, জীবনভরা এই কঠিন পরিশ্রম সবই পণ্ড হল।—

জননী! তোমাব পায়েব শৃঙ্খল বুঝি খুলতে পাবলুম না। দীনা, হীনা লাঞ্ছিতা ভাবতমাতা! পঞ্চাশ বৎসর তোমার সুধাস্তন্য দিয়ে কেন এই অকৃতী সন্তানকে পালন কবেছিলে? তোমার চোখের একবিন্দু অশ্রুও বুঝি মুছিয়ে দিতে পারলুম না,—উঃ!

[দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

লক্ষ্মী — [অগ্রসব হইয়া আসিয়া সুভাষেব হাত ধবিয়া] ছি, শিপাহ্-শালাব! তুমি ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। আমবা যতদিন আছি, ততদিন তোমার সব আছে. কিছুই যায় নি। মুখ

তোল। আমাদের মুখে তাকাও। যা গেছে তা যাক্‌, আবার নূতন করে আরম্ভ কর।—

[শেষ দিকে লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। সুভাষ মুখ তুলিতেই উপস্থিত সকলে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুভাষের চোখে আবার জল ছুটিল]

শা নওয়াজ—[সজল চোখে] নেতাজী! একবার হুকুম দাও চল্লিশ হাজার মুক্ত তরবারি এই মুহূর্তে ইম্‌ফালে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইম্‌ফল তোমার হাতে এনে না দিয়ে তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে আস্‌বে না।

সুভাষ—[দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া] হুকুম দেবার মালিক এখন আর আমি নই শা নওয়াজ। আড়াল থেকে একটা বৃহত্তর শক্তি বজ্রনির্ঘোষে আজ হুকুম দিচ্ছে। এখন থেকে তার হুকুমই মানতে হবে। আমি নিরুপায়।

শানওয়াজ—তোমার হুকুম যারা পেয়েচে, প্রাণ থাকতে অন্যের কাছে তারা হুকুম নেবে না নেতাজী। আমরা তোমার হুকুমই নেব, তার জন্য যা হয় হোক্‌।

লক্ষ্মী — অবসাদ দূর কর নেতাজী। আবার সিংহবিক্রমে মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। হতাশায় মুহ্যমান্‌ হয়ে থেকো না। তুমি বীর শ্রেষ্ঠ। জয় পরাজয়ের বহু উর্দ্ধে তোমার দৃপ্ত শির। শত বিপর্য্যয়ের সাধ্য নেই তোমার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। উঠো আবার নূতন করে ছিন্ন সূত্র হাতে তুলে নও। আমরা প্রাণ দিয়েও সফল করব।

সুভাষ— হতাশা লক্ষ্মী? কি করে বোঝাব ভাগ্যদেবীর কি মর্ম্মান্তিক পরিহাসে ভিতরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে! চরম সার্থকতার মুখে, জয়যাত্রার সিংহদ্বারে এসে যেন অশনি সম্পাত হল। চোখের পলক না ফেল্‌তে সব ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল!—হা ধিক্‌,

ধিক্ এ জীবনে। ধিক্ বাংলার কবি, আজ হতে বর্ষার স্তব গানে মুখর হয়ে উঠো না। ও কালনাগিনীকে চিরতরে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত কর। দেখ সে কি করেচে! মুখ ব্যাদান করে দীর্ঘ সাতদিন কুরুযুদ্ধে কর্ণের মত আমাদের রথচক্র গ্রাস করে আছে সে রাক্ষসী। যে দীর্ঘ সাতদিনে আমরা কলকাতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তুম সে মহার্ঘ দিনগুলি সে আমাদের নিষ্ক্রিয় করে শিবিরে শিবিরে অবরুদ্ধ করে রেখেচে। একবার যদি কলকাতায় গিয়ে দাঁড়াতে পারতুম! একবার বাঙ্‌লার ছেলেদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে পারতুম! একবার বাঙ্‌লার মেয়েদের নিহিত বীর্য্য পাঞ্চজন্য নিনাদে সাড়া দিয়ে উঠ্‌ত! তবে কি এমন সর্ব্বনাশ হতে পারত? তবে কি আর চিন্তা ছিল কিছু? চীনে যা হয়েচে, রাশিয়া যা করেচে, ভারত তার চেয়ে একতিল কম করত না। দেশের মাটি এগিয়ে গিয়ে ভারত শত্রুকে গ্রাস করত। হতাশা লক্ষ্মী! মর্ম্মভেদ করে রুদ্ধ আক্রোশ বেরিয়ে আস্‌তে চায়, ফোঁসে উঠে, গর্জ্জে উঠে, কত আর সামলে রাখি?

লক্ষ্মী — যা গেছে তা যাক নেতাজী। যা ফিরে আস্‌বে না তার জন্য বৃথা ক্ষোভ। সম্মুখে রণক্ষেত্র! আবার উঠে দাঁড়াও। যে বিরাট শক্তি, যে অপূর্ব্ব তপস্যা সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেই একদিন জয়ী হয়েছিল, আবার তাকে জাগিয়ে তোল। এবার আর কোনো সংশয় নেই, এবার দ্বিধালেশ নেই কারো মনে। তোমায় আমরা চিনেচি। এবার আর বৃথা বাক্যব্যয় নেই, এবার আর পিছিয়ে পড়া নেই। ঝড়ের বেগে দূর হতে দূরান্তরে ছুটে যাব। এস নেতাজী, রণক্ষেত্রে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াও।

সুভাষ — তা আর হয় না লক্ষ্মী। যদি লেশমাত্র উপায় থাক্‌ত তবে কি এমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়তুম? এখন দিনে দিনে শত্রুর বল বেড়ে যাবে। আমরা তৈরী হতে হতে তারা আমাদের সব সৈন্য গ্রাস করে ফেল্‌বে। এখন মরেও কাজ হবে না। বহু প্রয়াসে শত্রু যে কাল বৈশাখীর উদ্বোধন করেচে তাকে ঠেকিয়ে রাখা

মানুষের সাধ্যাতীত। সে কালবৈশাখী যে দিক দিয়ে বয়ে যাবে তার আর কিছুই রেখে যাবে না। সব নিশ্চিহ্ন করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের তরী অকূলে ভাস্‌চে, তাকে ডাঙ্গায় এনে ভিড়িয়ে ফেলতে হবে, নইলে তা ডুববে। যদি কলকাতায় পৌঁছুতে পারতুম! কলকাতার কূল পেলে আজ কি ও কালবৈশাখীকে ভয় করতুম? ঝড়ের মুখে তুড়ি মেরে বলতুম, তোর জন্য আমি প্রস্তুত। এ যে অতর্কিতে অকূলে কাল বৈশাখী আমাদের ধরেচে। আজ পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে।

শানওয়াজ—না, নেতাজী, না। আমরা কিছুতেই পালাব না। ঝড়ের মুখে মুক্ত তরবারি হাতে লড়াই করতে করতে মরব। মরতে মরতেও বলে যাব আমরা অপরাজেয়, পরাজয় জানি নে।

লক্ষ্মী — তবে কি কোনো উপায়ই নেই? এত আশা, এত ভরসা এত বুকের রক্ত দিয়ে তিলে তিলে স্বর্গসোপান তৈরী করে তোলা সবই কি বৃথা হয়ে যাবে?

[চোখে অশ্রু নির্গত হইল]

সুভাষ — [আত্মসম্বরণ করিয়া সান্ত্বনার সুরে ও ভঙ্গীতে] কিছুই বৃথা যায় না লক্ষ্মী। অসমাপ্ত কার্য্যভার, অসমাপ্ত তপস্যা, এক অখণ্ড সার্থকতার বিরামস্থল বলেই জেনো। সে-তপস্যা নূতন করে সুরু হবে, সে-কাজের ভার নূতন করে আবার নবীন বাহু তুলে লবে। নব অঙ্কুর জাগ্‌বে। নবীন শাখা পল্লবে আবার মহা অটবী অভ্রভেদী শির আকাশে তুলে দাঁড়াবে। আমরা হয়তো তা দেখে যাব না, কিন্তু তাতেই বা দুঃখ কি?

লক্ষ্মী — [সজল চোখে] নেতাজী তোমার এত সাধের, এত আরাধনার স্বর্গ তুমিই দেখতে পাবে না? না, না, সে কল্পনাও যে অসম্ভব তা হবে না, হতে পারে না, আমরা তা হতে দেব না।

সুভাষ — [কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া] তবে তাই হোক্। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। শিবিরে শিবিরে হুকুম পাঠাও আত্মরক্ষা করে করে তারা পিছিয়ে আসুক। বৃথা প্রাণক্ষয় না হয়। যতদিন ফিরে না আসি ততদিন নেতাজীর এই শেষ

হুকুম। যদি সব পথ বন্ধ হয়ে যায় তবে স্বাধীন সেনার মর্য্যাদা দাবী করে আত্মসমর্পণ করবে নইলে লড়বে। দেশ শত্রুর হাতে তুলে দেবার আগে অবাজকতা দমন করে রাখবে। শ্বেতাঙ্গদের মতো ঘৃণিত আচরণ তোমরা করো না, অত্যাচার, উৎপীড়নের মুখে দেশকে সঁপে দিয়ে তোমরা পালিয়ে যেও না। ক্ষুধার্ত্তকে যথাসাধ্য অন্ন দিও, আহতকে শুশ্রূষা করো। আর্জ্জি হুকুমতে আজাদ হিন্দ্ কে আমার আদেশ জানাও। দেনা পাওনার বিলি ব্যবস্থা করে ওরা স্থানত্যাগ করতে প্রস্তুত হোক্। ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে আজাদহিন্দ্ ব্যাঙ্কে যদি কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তবে তোমাদের ভরণ পোষণের জন্য তা যেন ব্যয়িত হয়। যদি কখনো দেশে ফিরে যেতে পার, শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পাও তবে মহাত্মাজীর চরণতলে ঠাঁই নিতে দ্বিধা বোধ করো না। বুড়ো সব জানে, বুড়ো আমাদের বুঝবে। বুড়ো অনেক সয়েচে, অনেক দেখেচে। তার বিরাট ব্যথার কাছে আমাদের অন্তর্জ্জ্বালা ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। তার হৃদয়ে আমাদেরও স্থান আছে, এই বুড়োই একদিন বলেছিলো, ভারতের যদি তরবারি থাকত তবে তোমাদের হাতে আমি তরবারিই তুলে দিতুম।— ইত্তেহদ্ এতমদ্ ও কুরবাণীর বাণী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে পালন করো। আমি চললুম। কবে দেখা হবে জানি নে। পথের শেষ কোথায় তাও জানা নেই। বহু সাধনায় আমি স্বাধীনতা লাভ করেচি, চিরজীবন আমি স্বাধীনই থাকব। পরাধীনতা আমার চিরতরে শেষ হয়েচে, পরাধীন ভারতে আমি আর ফিরে যাব না। যেদিন ফিরে যাব সেদিন দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে।—ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ্! আজাদহিন্দ্ জিন্দাবাদ্! জয় হিন্দ্।

লক্ষ্মী — ওকি? চলে যাচ্ছ নেতাজী? কাউকে সঙ্গে নিলে না? কিছুই সঙ্গে নিলে না, যেমন দাঁড়িয়েছিলে তেম্নি চললে? না, না, সে হতে পারে না। তুমি ভারতের রাজ রাজেশ্বর। ভারত তোমাকে এমন করে ছেড়ে দিতে পারবে না। আমাদের তুমি সঙ্গে লও।

সুভাষ — এ পথে একাই যেতে হয় লক্ষ্মী, ভয় কি? আমি আবার ফিরে আসব। নিবিড় তমিস্রা উত্তীর্ণ হয়ে নবীন উষা আসে। অন্ধকার যত গভীর হয় আলোও ততই কাছে আসে, ভয় কি?

লক্ষ্মী — যে গভীর রহস্য লোক থেকে হঠাৎ একদিন এসেছিলে, সেই রহস্যলোকে হঠাৎ একদিন ফিরেও চললে। সুরু থেকেই যে অভ্রভেদী উচ্চশির নিয়ে আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালে তার নাগাল সেদিনও কেউ পায়নি আজও কেউ পেলে না! তুমি কে? তুমি কি আমাদেরই মত রক্তে মাংসে গড়া মানুষ? এত কোমল হৃদয় মানুষ ছাড়া তো হয় না! আবার এত কঠিন প্রাণ, সে তো মানুষের নয়! তবে তুমিই কি মহামানব? দুদিনের জন্য তোমার সাহচর্য্য লাভ করে নূতন হয়ে গিয়েছিলুম আজ তোমাকে হারিয়ে তার কিছু ধরে রাখতে পারব কি?

[সুভাষ গমনোদ্যত হইলেন]

ও, কি, চললে? না, না, নেতাজী! আমার যে অনেক কথা জানবার আছে।—

[সুভাষ চলিতে লাগিলেন]

তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে নেতাজী। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও!—

[সুভাষ ষ্টেজের অন্য সীমায় আসিয়া পড়িলেন]

নে - তা - জী - !

[সুভাষ একবার ফিরিয়া চাহিয়া অদৃশ্য হইলেন]

সকলে — নেতাজী—। নে - তা - জী।

যবনিকা